সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

কলিকাতা।

বাণবাজার ২নং আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গলি
স্মিথ এণ্ড কোম্পানির যন্ত্র হইতে
শ্রীকেশব লাল রায় দ্বারা।
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৪ সাল।

উপক্রমণিকা।

সর্পাঘাতে মৃত্যু কিরূপ ভয়ঙ্কর ও যন্ত্রণাদায়ক, তাহা যাঁহারা কখন না দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। এক ব্যক্তি সুস্থ ও সবল রহিয়াছে, হঠাৎ তাহাকে সর্পে দংশন করিল। অমনি তাহার বলবিক্রম কোথায় চলিয়া গেল, শরীর এলাইয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে সে ধরাশায়ী হইল। সে দেখিতেছে যে, তাহার জীবনীশক্তি অতি দ্রুত-গতিতে হ্রাস হইতেছে, সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ইহা নিবারণ করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে, এবং সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে, আর একটু পরেই তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সম্মুখীন বিপদ বুঝিতে পারিয়া ভয়াকুল চিত্তে তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে; আর রোগী হতাশ নয়নে তাহাদিগের দিকে চাহিতেছে। তাহার দেহের কষ্ট তাহার বদনে প্রকাশ পাইতেছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে ও দীপ্তি ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, আর রোগী পিপাসায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে। তখন তাড়াতাড়ি জল খাইলেই গলায় আটকাইয়া যাইতেছে, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে।

ক্রমে চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল, নিশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল, আর রোগীর জ্ঞানও সেই সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইতে লাগিল। তাহার পর মুখ দিয়া লালা পড়িতে লাগিল, ও ক্রমে শরীর পাঙ্গাশ বর্ণ হইয়া আসিল। তখন খেচুনি আরম্ভ হইল, হইয়া মৃত্যু হইল।

কোন কোন সর্পের দংশনে শরীর ফুলিয়া ঢাক হয়। কখন কখন জিহ্বা এত ফুলিয়া পড়ে যে, মুখের মধ্যে ধরে না বলিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আর গাল ফুলিয়া চক্ষু বুঁজিয়া যায়। কখন কখন পেট ফুলিতে থাকে, শেষে মরিবার সময় তাহাকে উদরী রোগীর ন্যায় বোধ হয়। এইরূপে একজন সুস্থ সবল ব্যক্তি সর্পাঘাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবন শূন্য দেহে ভীষণ আকার ধরিয়া পড়িয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্টের তালিকা অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ হাজার লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। লোকদিগকে এই মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ এক একটী বিষাক্ত সর্প মারিতে পারিলে দুই আনা করিয়া পুরস্কার দিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইতেছে না। কারণ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের জন্য যে পুরস্কার দিয়া থাকেন, সে অতি সামান্য। অনেক সময়ে এই পুরস্কার লইবার জন্য অনেক দূরের পথ যাইতে হয়, আবার পুরস্কার অপেক্ষা পাথেয় খরচ অধিক পড়িয়া যায়। সুতরাং অনেকে এই সামান্য পুরস্কারের লোভে আপন জীবন বিপদাপন্ন করিতে ইচ্ছা করে না। তাহার পর, বিষাক্ত সর্পের

সংখ্যা এত অধিক যে, এইরূপে উহা ধ্বংশ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা বৎসর বৎসর প্রায় সমভাবে থাকিয়া যাইতেছে।

সর্পাঘাতের মৃত্যু হইতে লোকদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা প্রণালী বাহির করা। ডাক্তার সর্ট, ফেরার, ওয়াল, রিচার্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান চিকিৎসকগণ সর্পদংশনের ঠিক ঔষধ বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, কেহ কেহ এখনও করিতেছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

আমরা এই পুস্তকে সর্পাঘাতের এক প্রকার চিকিৎসা প্রণালীর কথা বলিব। যদি ঠিক এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করা যায়, তবে সর্পদষ্ট ব্যক্তির মরিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি কখন মরে, তবে সে অনবধানতা বা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ, চিকিৎসার দোষে নহে। এই চিকিৎসা প্রণালী অতি সহজ ও বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র সম্মত। বহু দিবস যাবত এই চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া, এবং এই প্রণালী অনুসারে বহুসংখ্যক সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিতে দেখিয়া ও করিয়া, আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হইয়াছে।

এদেশে মালবৈদ্য, সাপুরিয়া প্রভৃতি কতক গুলি জাতি আছে। ইহারাই উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে সর্প চিকিৎসা করিয়া থাকে। ইহাদের চিকিৎসা প্রণালী একরূপ অব্যর্থ, এবং এই নিমিত্ত ইহারা স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে। ইহাদিগের আচার

ব্যবহার কতক হিন্দু কতক মুসলমানদিগের ন্যায়। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই; দশ বিশ ঘর লোক একত্রে, আবশ্যকীয় সাংসারিক তৈজসপত্র সহ, স্থানে স্থানে "টোল" অর্থাৎ বাঁশের তাম্বু ফেলিয়া বাস করে। বিষাক্ত সর্প ধরা, সর্প খেলান ও সর্পাঘাতের চিকিৎসা করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। শৈশব হইতেই ইহারা এই ব্যবসা শিক্ষা করে। দিবানিশিই সর্প লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, অকুতোভয়ে গর্ত্তের ভিতর হাত দিয়া বিষাক্ত সর্প ধরিতেছে, অবলীলাক্রমে সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিতেছে, এমন কি, ইহারা একরূপ সর্পের মধ্যেই বাস করিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত্যুর কথা প্রায় শুনা যায় না। মনে ভাবুন, ইহাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যদি কিছু অনিশ্চিত থাকিত, তবে কি ইহারা বালক বৃদ্ধ যুবা মিলিয়া সর্প লইয়া খেলা করিতে পারিত? সর্পে ইহাদিগকে সহসা দংশন করিতে পারে না সত্য, কিন্তু দংশন করিলেও ইহারা আপনাদিগের চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিয়া বাঁচিয়া যায়। ইহারা যাদুবিদ্যা কি মন্ত্র তন্ত্র বিশ্বাস করে না, এবং অতি অল্প ঔষধই ব্যবহার করে। যখন কোন উগ্র সর্পের দংশনে পাঁচ মিনিটের মধ্যে দষ্টব্যক্তি মরিতে পারে, তখন ঔষধে কি করিতে পারে?

— —

সর্পাঘাতের চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

নানা জাতীয় সর্প।

সর্প নানা জাতীয় আছে। ইহাদের অধিকাংশেরই আবাসস্থান উষ্ণপ্রধান দেশ। যে সমুদায় স্থানে মনুষ্যের বেশী গতায়াত নাই, সেই সকল স্থানেই প্রায় সর্প থাকে। পতিত পাঁজা, পরিত্যক্ত পুরাতন বাড়ী পতিত ও পোড়া ভিটা, গোক্ষুরা প্রভৃতি সর্পের প্রিয় বাসস্থান। কেউটাদিগের অবস্থিতি স্থান বিল। পাতরাজ প্রভৃতি অনেক সর্প সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে ও পর্ব্বতে থাকে। ঢোঁড়া প্রভৃতি সর্প জলেই বাস করে। কানড় ও ঘরচিতা প্রায় ঘরেই বাস করে। লাউলড়া প্রভৃতি কতকগুলির আবাসস্থান আবার বৃক্ষ, তবে তাহারা ভূমিতেও চলাফেরা করে। দাঁড়াশ, হেলে, চেলা প্রভৃতি সর্প যেখানে সেখানেই দেখা যায়। সৌভাগ্যক্রমে, ইহারা নিরীহ ও বিষশূন্য। ভারি বর্ষার সময় সুন্দরবন ও পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে অনেক সর্প ভাসিয়া আসিয়া জনসমাজে উপস্থিত হয়। কিন্তু জল সরিয়া গেলে

আবার তাহারা চলিয়া যায়, তবে দুই একটী এদেশে থাকিয়া যায়।

সর্পেরা মেরুদণ্ডস্থিত অস্থি সমুদায়ের সঞ্চালন দ্বারা গমনাগমন করে। সর্পের গতি অতি দ্রুত, এবং এক জাতীয় সর্প ভিন্ন, অপর সকলের গতিই শব্দবিহীন। সুতরাং ইহাদের চক্ষে শিকার পড়িলে প্রায় পলাইয়া যাইতে পারে না। শিকার পলায়ন পরায়ণ হইলে, সর্প রাগভরে ও দৃঢ় সঙ্কল্প সহ অতি দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এইটী সর্পের ভয়ানক সময়। এই সময় সর্পের সম্মুখে যে পড়ে, তাহার প্রায় নিস্তার থাকে না। কোন কোন সর্প একরূপ শব্দ করিয়া আহারীয় প্রাণীগণকে নাকি মোহিনী মন্ত্রদ্বারা আকৃষ্ট করে। শাখনী (রাজসাপ) সর্পেরা নাকি এইরূপ মন্ত্রবলে অন্যান্য সর্পগণকে আকৃষ্ট করিয়া গলাধঃ করে।

সর্পগণ অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়। সুমধুর-স্বরে তাহারা আকৃষ্ট ও মোহিত হয়। একদিন আমরা জনকয়েক তানপুরা, শেতারা, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রের সহিত গান করিতেছি, ইহার মধ্যে কোথা হইতে একটি সর্প আসিয়া তথায় উপস্থিত। প্রথমে সর্প কাহারও চক্ষে পড়ে নাই, শেষে দেখি সে মস্তকটি একটু উত্তোলন করিয়া যেন মোহিত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে। সঙ্গীত যেমন ক্ষান্ত হইয়াছে, আর সর্পটি অমনি পলায়ন করিল। আর একদিনও এইরূপ হয়। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে, শীশ দিলে সাপ ঘরে আইসে। পশ্চিম অঞ্চলে সাপুড়িয়ারা তুড়মির সুমধুর স্বরে সাপ আবদ্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু তুড়মিওয়ালারা

এদেশে আসিয়া তুড়মি বাজাইয়া ঘর হইতে যে সাপ বাহির করে, সেটি বোধহয় চাতুরী।

সমতল ভূমি অপেক্ষা পার্ব্বতীয় প্রদেশের সর্প সকল আকারে বড় হয়। তাহার কারণ সমতলভূমি ও জলপূর্ণ স্থানে যত সর্প নিহত হয়, পার্ব্বতীয় প্রদেশে ততটা হয় না, সুতরাং অধিক দিন বাঁচে ও আকারেও বড় হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, বৃদ্ধ হইয়া কি পীড়িত হইয়া সর্প কখন মরে না।

সাধারণতঃ সর্প দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—বিষাক্ত ও বিষশূন্য। বিষশূন্য সর্পের দংশনে রোগীর কোন জীবনের আশঙ্কা নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না।

বিষাক্ত সর্প অনেক জাতীয় আছে। সর্প চিকিৎসকেরা এই বিষাক্ত সর্পদিগকে চৌসাপা বলে, অর্থাৎ ইহাদিগকে চারি ভাগে বিভক্ত করে; যথা, (১) বড়ফণী, (২) কেউটে, (৩) গোক্ষুরা, এবং (৪) বোড়া। কানড় সর্পও বিষাক্ত, কিন্তু কানড়কে ইহারা চৌসাপার মধ্যে ধরে না।

ইহার মধ্যে গোক্ষুরা জাতীয় সর্পই সর্ব্বপ্রধান। কারণ ইহাদের সংখ্যা অধিক ও সর্ব্বস্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদিগের আরও কতকগুলি নাম আছে; যথা, খুরিশ, গোহমা ইত্যাদি। এই জাতীয় সর্পের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রকার আছে। একটু ভাল করিয়া দেখিলেই ইহাদিগকে সহজে বিভিন্ন করা যাইতে পারে। এই সর্পের মধ্যে কতকগুলি ঈষৎ সাদা, ইহাদিগকে খয়েগোক্ষুরা বলে; কতকগুলি ঈষৎ কাল, ইহাদের নাম কালিগোক্ষুরা; আবার কতকগুলি হরিদ্রা

বর্ণের, ইহারা পদ্মগোক্ষুরা বলিয়া খ্যাত। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই গোক্ষুরা সর্প দেখা যায়।

কানড় সর্পের সংখ্যাও কম নহে, এবং ইহারাও নানা প্রকারে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই ইহাদের অধিক প্রাদুর্ভাব। সেখানে ইহাদিগকে করাতি সর্প বলে। বঙ্গ-দেশে ইহাদিগকে শাখাপটি কানড় বলে। ইহাদের আর একটী নাম বিষাক্ত চিতা। তাহার কারণ, ইহারা দেখিতে অনেকটা চিতা সর্পের মত। কিন্তু চিতার বিষ নাই। অনেকে বলেন যে, যদিও চিতার বিষদন্ত নাই, কিন্তু ইহাদের মুখে এক প্রকার লালা আছে, উহা বিষাক্ত। উহারা দংশন না করিয়া লেহন করে, এবং সেই স্থানে লালা লাগিয়া ক্রমে ফুলিয়া উঠে। কিন্তু ইহা কতদুর সত্য তাহা বলিতে পারি না।

বিষাক্ত সর্পের মধ্যে কানড় সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ। তাহার কারণ, অন্য কোন বিষাক্ত সর্প মনুষ্যের সংসর্গে প্রায় আসে না, কিন্তু কানড়ের প্রকৃতি ইহার বিপরীত। ইহারা মনুষ্যের নিকটে থাকিতেই ভালবাসে। গৃহের সর্ব্বস্থানেই তাহাদের গতিবিধি আছে। দোতালার উপর আমরা ইহার ডিম দেখিয়াছি। কিন্তু ইহারা অতি নিরীহ, বিশেষ আঘাত না পাইলে, কখন কাহাকে কিছু বলে না। তুমি শুইয়া আছ, হয়ত প্রাতে উঠিয়া দেখিবে একটী কানড় সর্প তোমার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তুমি নিদ্রিত অবস্থায় তাহাকে কোনরূপ আঘাত কর নাই, তাই এ যাত্রায় বাঁচিয়া গিয়াছ। কাল বর্ণের এক প্রকার কানড় আছে, মালবৈদ্যেরা তাকে কালাজ বলে। কানড়ের মধ্যে ইহারাই আকারে

সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এক প্রকার কানড় জলে বাস করে, ইহা-দিগকে পাণি-চিতা বলে। তাহাদিগকে প্রায় ধান্যক্ষেত্রে দেখা যায়, এবং সেইজন্য কৃষকেরা তাহাদিগকে বড় ভয় করে।

ফণাধারী সর্প মাত্রেই অতিশয় উগ্র, কিন্তু কোন প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত না হইলে, তাহারা প্রায়ই দংশন করে না। আমরা একটী ঘটনা অবগত আছি। এক দিন অন্ধকার রাত্রে বৃষ্টি হইতেছে, সেই সময় একটী ভদ্রলোক ঘরের পিড়ার উপর মাদুর পাতিয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখেন, একটী সর্প তাঁহার পা বাহিয়া উঠিতেছে। ভদ্রলোকটীর অত্যন্ত মনের বল ছিল। তিনি জানেন যে, একটু নড়িলেই সর্প নিশ্চয় দংশন করিবে। তাই তিনি দৃঢ়মনে নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন, সর্পটী তাঁহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। তখন একটী আলো আনিয়া দেখেন যে, একটী গোক্ষুরা সর্প!

অনেকে ভাবেন কেউটা ও গোক্ষুরা এক জাতীয়। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। কেউটা গোক্ষুরা অপেক্ষা অনেক বড় ও অধিক বলশালী, এবং সাধারণ গোক্ষুরার ন্যায় তাহার ফণা অধিক চওড়া নহে। এক জাতীয় কেউটা আছে, তাহারা শামুক ভাঙ্গিয়া খায়, সেই জন্য তাহাদিগকে "শামুক-ভাঙ্গা" কেউটা বলে। কেউটারা মাঠে ও জলাশয়ে বাস করে। ইহারা লোকালয়ে বড় আসে না, এবং গোক্ষুরা অপেক্ষা সন্তরণে অধিক পটু। গোক্ষুরা জোড়া বান্ধিয়া বাস করে, কিন্তু কেউটা শত সহস্র মিলিত হইয়া একত্রে থাকে। কেউটারা অপর কোন সর্পকে তাহাদের নিকট আসিতে দেয় না।

কিন্তু বংশবৃদ্ধির সময় কখন কখন গোক্ষুরা ও কেউটা সম্মিলিত হয়, এবং উহাদের সংযোগে এক প্রকার নূতন সর্পের সৃষ্টি হয়, তাহাকে "দোরাগা" বলে। পাতরাজ ও দুধ-রাজ সর্পের সংযোগে এইরূপে "শঙ্করচুর" সর্পের উৎপত্তি। ফণাধারী ও ফণাহীন সর্পেরও কখন কখন সংযোগ হয়, এবং ইহাতেও অনেক নূতন নূতন সর্পের সৃষ্টি হয়।

পাতরাজ, দুধরাজ, বঙ্করাজ, শঙ্করচুর, মণিচুর, প্রভৃতি সর্প "বড়-ফণীর" অন্তর্গত। ইহাদের ন্যায় উগ্র ও ভয়ঙ্কর সর্প বোধহয় পৃথিবীতে আর নাই। গোক্ষুরার মতন ইহাদেরও ফণা আছে, কিন্তু গোক্ষুরা অপেক্ষা ইহারা অনেক বড়, কখন কখন ৯।১০ হাত লম্বা হয়। ইহাদের বিষদাঁতও অপেক্ষাকৃত বড়, সুতরাং ইহাদের দংশনও অধিক সাংঘাতিক। ইহারা স্বভাবতঃ খুব উগ্র, এবং এত বল-শালী যে মনুষ্য কি পশু, কাহাকেও ইহারা গ্রাহ্য করে না। সৌভাগ্যক্রমে ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প, এবং মনুষ্যের সংসর্গ ইহারা ভালবাসে না, সুতরাং লোকালয় হইতে দূরে থাকে। বাঙ্গলা দেশে কেবল সুন্দরবনে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মাঝে মাঝে লোকালয়েও আসিয়া থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার চলিয়া যায়। মালবৈদ্যেরা সুন্দরবনে যাইয়া ইহাদিগকে ধরে। কিন্তু ইহাদিগকে ধরা বড় বিপদজনক।

গোক্ষুরা, কেউটা প্রভৃতি সর্প খুব বড় না হইলে এক জনে অবলীলাক্রমে ধরিতে পারে। কিন্তু পাতরাজ প্রভৃতি ধরিতে তিনজন লোকের আবশ্যক। বড় হইলে ইহারা এত বলশালী হয় যে, এক জন মানুষ ইহাদের সঙ্গে জোরে পারিয়া উঠে না।

যদি এক জন যাইয়া ইহার গলা ধরে, তবে সাপ লেজ দ্বারা ধৃতকারীর শরীর, পদ, কি বাহু জড়াইয়া ধরিবে, এবং এত জোরে টানিতে থাকিবে যে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া যাইবে, এবং হয় ত ইহাতে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। গোক্ষুরার গলার হাড় শক্ত, সুতরাং গলা ধরিলে ইহারা আর ছোঁ মারিতে পারে না। কিন্তু পাতরাজ জাতীয় সর্পের গলার হাড় এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত যে, গলা ধরিলে ইহারা অবলীলাক্রমে ফণা ফিরাইয়া দংশন করিতে পারে। সেই জন্য ইহাদিগকে ধরিবার সময় প্রথমেই ইহাদের ফণা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হয়। যদি কোন প্রকারে ঠিক ফণাটি না ধরা যায়, তাহা হইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া দংশন করিবে, এবং হয়ত ইহাতে ধৃতকারীর ইহলীলা শেষ হইবে। সুতরাং, ইহাদিগকে ধরিবার জন্য বিশেষ পারদর্শী লোকের আবশ্যক। ইহারা ভূমি হইতে অনেক উচ্চ হইয়া ফণা ধরিতে পারে, এবং বিদ্যুৎগতিতে আসিয়া ছোঁ মারে। সুতরাং ঠিক ছোঁ মারিবার সময় ইহাদিগের ফণা চাপিয়া ধরা আবশ্যক।

মালবৈদ্যেরা শীতকালে, অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুন মাসে, এই জাতীয় সর্প ধরিবার জন্য সুন্দরবনে গমন করে। এই সময় সর্পেরা নিস্তেজ হইয়া থাকে। এখানে বলা কর্ত্তব্য যে, বর্ষাকালে সর্প অতিশয় তেজশালী থাকে। সুতরাং সে সময় তাহাদিগকে ধরিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। শীতের সময় ইহারা প্রাতঃকালে গাছে উঠিয়া রৌদ্র পোহায়। সেই সময় পক্ষীরা আসিয়া ইহাদিগকে বিরক্ত করিতে থাকে। তাহারা সর্পের

চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায় এবং বিকৃতস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করে। আর সর্পটী ফোঁস ফোঁস করিয়া এদিকে ওদিকে ছোঁ মারিতে থাকে। ইহাতে সেখানকার লোকেরা বুঝিতে পারে যে, সেই গাছে পাতরাজ জাতীয় কি ঢামনা সর্প আছে। ঢামনা সর্প কৃষ্ণবর্ণ ও বিষশূন্য। মালবৈদ্যেরা স্থানীয় লোকের নিকট অনুসন্ধান পাইয়া, সর্প ধরিবার জন্য প্রাতে সেখানে গমন করে। তাহারা বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সর্পটী তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। মনের ভাব এই যে, "আমি এখানে আছি, নিকটে আসিও না।" এই ভাব না বুঝিয়া যদি কেহ তাহাদের আরো নিকটে যায়, আর সর্পটী যদি খুব তেজোবন্ত ও বড় হয়, তবে সে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িবে, এবং আগন্তুক ব্যক্তিকে আক্রমণ করিবে।

কিন্তু সাধারণতঃ সর্প গাছের উপর হইতেই গর্জ্জন করিতে থাকে। তখন মালবৈদ্যরা এক খানি লম্বা বাঁশ লইয়া তাহার গলায় ফাঁসি দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফাঁসি দেওয়া বড় দুর্ঘট। সর্প এরূপ অবস্থায় অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, গাছ হইতে লাফাইয়া পড়ে, এবং ভূমিতে পড়িয়াই শান্তিভঙ্গকারিদিগের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু একে শীতের সময়ে নির্জ্জীব হইয়া থাকে, তাহার পর গাছের উপর হইতে পড়িয়া, সর্প বিলক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়।

সর্প কর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়া মালবৈদ্যেরা সারি দিয়া দাঁড়াইল, এবং মনোনিবেশপূর্ব্বক সর্পের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সর্প যত অগ্রসর হইতেছে, তাহারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদে হটিতেছে। মধ্যে মধ্যে সর্প মাথা তুলিয়া ছোঁ

মারিতে যাইতেছে, আর তাহার চলন থামিয়া যাইতেছে। এইরূপে তাহার গতি ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। মালবৈদ্যেরা এদিকে বাম হস্ত বাড়াইয়া খুব সতর্কের সহিত সর্পকে খেলাইতে লাগিল। সর্প ফণা ধরিয়া হাতে ছোঁ মারিবার চেষ্টা করাতে, তাহার গতি একবারে বন্ধ হইয়া গেল। তখন সর্প খুব জোরের সহিত ও ত্বরিত গতিতে একজনের হাত লক্ষ্য করিয়া ছোঁ মারিল, মালবৈদ্যও সেইরূপ ত্রস্তভাবে হাত সরাইয়া লইল, কাজেই ছোঁ মাটিতে পড়িল। বারম্বার এইরূপ মাটিতে ছোঁ পড়িতেছে, ইহাতে সর্প খুব আঘাত পাইতেছে, ও ক্রমে ক্লান্ত হইতেছে; সেই সঙ্গে সঙ্গে বিষদাঁত হইতে অনেক বিষও বাহির হইয়া পড়িতেছে, আর সর্প ক্রমে নির্ব্বিষ হইতেছে।

মালবৈদ্যেরা এইরূপ সর্প লইয়া খেলা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে সর্পের ফণার দিকে। কি প্রকারে ফণা চাপিয়া ধরিবে, কেবল তাহারই সুযোগ দেখিতেছে। কারণ ফণা ধরিতে যাইবার সময় একটু লক্ষ্যচ্যুত হইলে, অমনি সে দংশন করিবে। যে হাত দিয়া সর্প খেলান হইতেছে, সর্পের সম্পূর্ণ দৃষ্টি সেই হাতের দিকে রহিয়াছে। এদিকে একজন সুবিধা বুঝিয়া ফণাটী ধরিয়া ফেলিল। সেই সময়, অপর একজন তাহার লেজ ও তৃতীয় ব্যক্তি তাহার মাজা চাপিয়া ধরিল। তখন সর্প, তাহাদের হাত হইতে আপন শরীর বিমুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু শরীরের নানা স্থানে ধৃত হইয়াছে বলিয়া, আর জোর করিতে পারিল না।

কিন্তু এরূপ বলবান সর্পও আছে যে, তিনজনেও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় সর্প যদি কোন প্রকারে তাহার শরীর বিমুক্ত করিতে পারে, তবে যে ব্যক্তি তাহার ফণা চাপিয়া ধরিয়াছে, সর্প লেজ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত শরীর জড়াইয়া ধরিবে। এরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য, তখনই সর্পের মাথা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসা।

পাতরাজ জাতীয় ছোট সর্পকে, কি যে সম্প্রতি খোলশ ছাড়িয়া নিস্তেজ হইয়াছে তাহাকে, একজনে সহজেই ধরিতে পারে। উপরে বলিয়াছি, গোক্ষুরার গলা ধরিলেই সে আর কিছু করিতে পারে না, কিন্তু পাতরাজ জাতীয় সর্পের গলা ধরিলেও তাহারা মুখ ফিরাইয়া দংশন করিতে পারে। সাধারণত গাছের উপর হইতেই ইহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। তবে মালবৈদ্যোরা বলে যে, কখন কখন বিশেষ কারণ বশতঃ তাহারা মাটিতে থাকিয়াও ঐরূপ আক্রমণ করে।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কেউটা সাপের নিকটে গেলেই তাহারা তাড়াইয়া আসে। কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, তাহারা এইরূপে তাড়াইয়া আসে না। তবে আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, যখন তাহাদের তেজ অধিক থাকে, তখনই কেবল তাহারা এইরূপে আক্রমণ করে। নদীয়া জেলার মধ্যে দামুড়হুদার নিকটবর্ত্তী একখানি নীলের জমীর মধ্যে একটী সরু পথ দিয়া একদিন আমরা পাল্কী করিয়া যাইতেছিলাম। সেখানে একটী সর্প লুকাইয়া ছিল। বেহারা-দিগের ডাকে সর্পটী রাগত হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

বেহারারা ভয়ে পাল্কী লইয়া পলায়ন করিল, কিন্তু সর্পটা তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইল না। সেটা যে কেউটা সর্প তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কারণ গোক্ষুরা সর্পেরা এত উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করে না, এবং তাহারা কেউটার ন্যায় হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয় না।

মালবৈদ্যেরা পাতরাজ জাতীয় সর্প ধরিয়াই তাহাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং ঝুড়ির মধ্যে পূরিয়া ফেলে। অন্য কোন সর্পের বিষদাঁত তখনই ভাঙ্গা হয় না, এবং কোন কোন সাপের দাঁত আদপেই তাহারা ভাঙ্গে না। বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপ প্রায় বেশী দিন বাঁচে না।

গোক্ষুরা ও কেউটা সর্প ধরা অনেক সহজ। মালবৈদ্যেরা ইহাদিগকে দেখিলেই লেজ ধরিয়া তুলিয়া ফেলে। ইহাতে তাহারা অনেকটা বেহাত হইয়া পড়ে। কিন্তু সাপ যদি সতেজ থাকে, তবে বিশেষ সাবধান না হইলে, অনেক সময় সে ধৃতকারীকে দংশন করিতে পারে। সেইজন্য তাহারা সাপটীকে তুলিয়াই ঝাঁকি মারে, কি লাঠি দ্বারা মস্তকে অল্প আঘাত করে, অথবা হস্ত প্রসারণ করিয়া সর্পটীকে দূরে ঝুলাইয়া রাখে।

মালবৈদ্যেরা সাধারণতঃ শীতকালে এই সাপ ধরে। যে গর্ত্তে সর্প থাকিবার সম্ভব, তাহা তাহারা দেখিলেই বুঝিতে পারে। কোন গর্ত্ত পাইলেই তাহারা উহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখে। গর্ত্তের মুখ যদি মাকড়শার জালে কিম্বা কোন আবর্জ্জনায় আবৃত থাকে, তবে সে গর্ত্তে সর্প থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সাপেরা আহার অন্বেষণার্থ সদাসর্ব্বদা গর্ত্তের

বাহিরে যাতায়াত করে। সুতরাং তাহাদের গর্ত্তের মুখে মাকড়শার জাল কি আবর্জনা থাকা সম্ভব পর নহে। যদি গর্ত্তের মুখে জাল না থাকে, এবং উহা তৈলবৎ মসৃণ দেখায়, তাহা হইলে তাহাতে সর্প থাকার সম্ভব। আবার গর্ত্তের মুখের কাছে, সর্প চলিয়া যাইবার কোন চিহ্ন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া, এবং ঐ স্থানের মাটি শুঁকিয়া দেখিয়াও, তাহারা বুঝিতে পারে যে গর্ত্তে সর্প আছে কি না। যেখান হইতে সর্প চলিয়া যায় সেখানে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। ইহাকে শালি গন্ধ বলে। কখন কখন গর্ত্তের মুখে কি নিকটে সাপের খোলশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেও তাহারা বুঝিতে পারে যে ঐ গর্ত্তে সর্প আছে। গর্ত্তে সর্প আছে ইহা জানিতে পারিলে মালবৈদ্যেরা ঐ গর্ত্ত খনন করিতে থাকে। তখন সর্পেরা, ইন্দুর কি ছুঁচোর ন্যায়, গর্ত্ত হইতে পলায়ন করে না, ভয় পাইয়া গর্ত্তের মধ্যেই থাকে। যেখানে সর্প আছে সেই পর্য্যন্ত খনন করা হইলে, সে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে, আর সেই সময় মালবৈদ্যেরা তাহার লেজ ধরিয়া ফেলে। গর্ত্ত খনন করিতে থাকিলে সর্প ভয়ে জড়িভূত হয়, সুতরাং তখন তাহাদের আক্রমণ করিবার স্পৃহা থাকে না।

ফণাহীন সর্প কিন্তু এইরূপে ধরা যায় না। কারণ তাহাদের লেজ ধরিয়া তুলিলেই তাহারা দংশন করিতে পারে। ইহাদিগকে ধরিবার প্রণালী অন্যরূপ। ফণাহীন সর্প দেখিলেই মালবৈদ্যেরা লাঠি দিয়া তাহের মাথা চাপিয়া ধরে। তাহার পর, এক হাত দিয়া উহার মুখ এবং অপর হাত দিয়া লেজ ধরে।

বড় বড় বোড়া সাপ এই প্রকারে ধরা যায় না।

ইহা ধরিবার প্রণালী আবার অন্যরূপ। প্রথম একজন ইহার লেজ ধরে। সর্প অমনি গর্জ্জন করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে যায়। সেই সময় অপর কয়েক জন সাপের সম্মুখে একটী ডোল ধরে। সর্পও একটী নিরাপদ স্থান পাইল ভাবিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। তখন তাহার লেজ ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর অমনি সর্পটী সেই ডোলের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন ঐ ডোলের মুখ ঢাকিয়া ফেলা হয়। অতি প্রকাণ্ড বোড়া, (যাহারা হরিণ ও মহিষ পর্য্যন্ত গলাধঃ করিতে পারে) ধরা কিছু কঠিন। ইহাদিগকে কাজেই শড়কি কি গুলি দ্বারা মারিয়া ফেলিতে হয়। চন্দ্র বোড়া, কলোই বোড়া, প্রভৃতি সর্প বোড়া জাতির অন্তর্গত। বিঘাতে বোড়া নামক এক প্রকার সর্প আছে। ইহারা এক বিঘাতের বেশী লম্বা হইবে না, এবং সেই জন্যই ইহা-দিগকে বিঘাতে বোড়া বলে। ইহাদের চলন অন্য সাপের ন্যায় নহে। ইহারা লাফাইয়া চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সর্পের স্বভাব।

বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সর্পেরা প্রায় কিছু আহার করে না। তখন মালবৈদ্যেরা জোর করিয়া উহাদের মুখের মধ্যে ইন্দুর কি বেঙ্গ পুরিয়া দেয়। বোড়া প্রভৃতি বিষশূন্য সর্পের বিষদাঁত নাই। তাহারা আহার পাইবামাত্র গলাধঃ করে এবং সেই জন্যই বোধহয় অনেক দিন বাঁচে। আমরা এক জন মালবৈদ্যকে একটী বড় গোক্ষুরা সর্পকে ছয় বৎসর বাঁচাইয়া রাখিতে দেখিয়াছি। অনাহারে তাহারা তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। সর্পেরা সমস্ত শীতকাল প্রায় অনাহারে কাটায়। তখন তাহারা অত্যন্ত নির্জ্জীব অবস্থায় থাকে, এবং বড় একটা চলা ফেরা করিতে পারে না।

শীত পড়িতে আরম্ভ হইলেই সাপেরা গর্ত্তের মধ্যে, কিম্বা পাহাড়ের কি দেয়ালের ফাটার মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শীতের কয়েক মাস সেখানেই থাকে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে এক প্রকার সর্প আছে, ইহারা শীতের সময়ও বাহির হয়। পৌষ মাসের দারুণ শীতের সময় এক জ্যোৎস্নাপূর্ণ রাত্রে আমরা দেওঘরের মাঠে এইরূপ একটী সাপ বেড়াইতে দেখিয়াছি। ইহারা দেখিতে অনেকটা লাউডগা বা লাউলড়া সাপের মত, কিন্তু তত সুশ্রী নহে। নিম্নবাঙ্গালা দেশে এরূপ সাপ আমরা কখন দেখি নাই।

শীতকালের রাত্রে গরম পড়িলেই সর্পেরা আহারের চেষ্টায় তাহাদের লুক্কাইত স্থান হইতে বাহিরে আসে, এবং বেঙ্গ, পাখী, ইন্দুর, গিরগিটি, এবং অন্যান্য ছোট ছোট সরীসৃপ, যাহা নিকটে পায়, তাহাই গলাধঃ করে। শাখনী বা রাজসাপ এবং পাতরাজ জাতীয় সাপ ছোট ছোট সাপ ধরিয়া আহার করে। শাখনী বা রাজসাপেরাও বিষাক্ত। ইহারা নাকি মোহিনী মন্ত্র দ্বারা অপর সর্পকে আকর্ষণ করে। আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। তবে যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের মুখে শুনিয়াছি যে, ছোট সাপ ইহাদের নিকট আসিলেই, একরূপ মুগ্ধ হইয়া যায় ও সে স্থান হইতে আর নড়িতে পারে না। তখন শাখনী ধীরে সুস্থে আসিয়া ইহাদিগকে গলাধঃ করে। এরূপও শুনা যায় যে, কখন কখন শাখনী এক স্থানেই চুপ করিয়া থাকে, আর ছোট সাপটী ক্রমে তাহার দিকে অগ্রসর হয়। তখন শাখনী উহাকে গলাধঃ করিবার জন্য মুখ প্রসারিত করে, আর ছোট সাপটী আপনাপনি উহার মুখের মধ্যে প্রবেশ করে।

গ্রীষ্ম পড়িলেই সাপেরা সন্ধ্যার পর তাহাদের লুক্কাইত স্থান হইতে বাহিরে আসিয়া বায়ু সেবন করে, এবং কেহ নিকটে আসিলেই সে স্থান হইতে সরিয়া যায়। কখন কখন তাহারা আদপে নড়ে না, বরং আগত ব্যক্তির পদশব্দ শুনিবা মাত্র ফণা তুলিয়া আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত থাকে। সর্প যে সেখানে আছে, ইহা জানিতে না পারিয়া যদি কেহ তাহার খুব কাছে যায়, তবে সাপ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছোঁ মারে। কানড় সাপ উৎপীড়িত না হইলে প্রায় নড়ে না, এবং কোন রূপ আঘাত না পাইলে প্রায় দংশন করে না।

গোক্ষুরা সর্প মনুষ্যের নিকট আসিতে চাহে না, সেইজন্য সন্ধ্যার সময় আহারের অন্বেষণে প্রায় বাহির হয় না। গভীর রাত্রে মনুষ্য নিশুতি হইলে তাহারা বাহির হয়, এবং ইন্দুর, ছুঁচো, মুরগী ও মুরগীর ডিম অন্বেষণার্থে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা ডিম একেবারে গিলিয়া ফেলিয়া দেয়। আহার অন্বেষণের সময়, কি বিষাক্ত কি অবিষাক্ত, সকল সর্পই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। শীকারের প্রতি যখন ধাবিত হয়, তখন সর্পগণ ক্ষুধায় কি লোভে এরূপ অন্ধ হয় যে, মনুষ্যের নিকটে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু অন্য কোন সময় তাহারা কখনই মনুষ্যের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইবে না। সর্প কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ইন্দুর যদি মশারীর মধ্যে প্রবেশ করে, সর্পও তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়া সেখানে যাইবে, এবং এইরূপে অনেক সময় শয্যাস্থিত ব্যক্তি সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হয়। ডিম ও পক্ষীশাবক সর্পের অতি প্রিয়, এবং ইহার জন্য তাহারা কোন বিপদ গ্রাহ্য করে না। গোক্ষুরা সর্পেরা মুরগীর ছানা যেরূপ গলাধঃ করিতে পারে, বড় মুরগী সেরূপ পারে না। তাহারা যে কখন কখন বড় মুরগী মারিয়া ফেলে, সে আহারের জন্য নহে, কেবল ক্রূর স্বভাব বলিয়া।

পক্ষীশাবক খাইবার জন্য সর্পেরা গাছের উপর উঠে এবং গাছের গর্ত্তের মধ্যে পাখীর বাসা আছে বুঝিতে পারিলেই, তাহার মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দেয়। এইরূপে একটী সাপকে আমরা মরিয়া ঝুলিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সাপটী গর্ত্তের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইয়াছিল, এবং গর্ত্তটী বড় বলিয়া মস্তকের অনেক খানি উহাতে প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল। ইহা

করিতে গিয়া আপনাকে সামলাইতে পারে নাই। অমনি ডাল হইতে লেজ সরিয়া পড়িল, এবং সর্পটী ঝুলিতে লাগিল। এইরূপে অনেকক্ষণ ঝুলিতে ঝুলিতে কাজেই সর্পটী মরিয়া গেল।

সর্পে গ্রীষ্মকালে ডিম পাড়ে। ভিন্ন ভিন্ন সর্পের সংযোগে শঙ্কর জাতীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ লোকে সর্পের সঙ্গম একটী শুভ চিহ্ন বলিয়া মানে। সেই জন্য ইহা দেখিতে পাইলেই সেখানে বিস্তর লোক সমবেত হয়; এবং এই সর্পযুগলের উপর তাহারা কাপড় ফেলিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস যে, ঐ সর্পযুগল যদি এই কাপড় কোন প্রকারে স্পর্শ করে, তবে ঐ কাপড়ে ঔষধের ও অন্যান্য গুণ প্রাপ্ত হইবে। আমরা প্রায় ডাড়স বা ঢ্যামন ও গোক্ষুরাতে এইরূপ সংযোগ হইতে দেখিয়াছি। এই কারণেই বোধহয় সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, ডাড়স পুরুষ ও গোক্ষুরা স্ত্রী জাতীয়, অর্থাৎ স্ত্রী সর্পেরিই ফণা ও বিষদাঁত থাকে। কিন্তু তাহা নহে। এরূপ সঙ্গমে যে সর্প সৃষ্টি হয়, তাহারা বিষাক্ত ফণী হয়, নির্ব্বিষ কৃষ্ণ-সর্প হয় না।

সর্পেরা শুষ্ক স্থানে ডিম প্রসব করে। কারণ ডিমে জল লাগিলেই নাকি উহা নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই বোধহয়, কোন বৎসর সর্পের সংখ্যা অধিক, ও কোন বৎসর অল্প দেখা যায়। সর্পশাবক ডিম হইতে বাহির হইয়াই, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, এবং আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ক্ষুদ্রকায় ও অল্প বয়স্ক বলিয়া তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। গোক্ষুরার এক দিনের ছানার দংশনেও মনুষ্য মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। নদীয়া জেলাস্থ হাসখালি গ্রামে একদিন একটী স্ত্রীলোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। লক্ষণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ

জানা গেল যে তাহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে। এই গ্রামে অনেক মালবৈদ্যের বাস। চিকিৎসার জন্য তাহাদিগকে তখনই ডাকিয়া আনা হইল। ক্রমে স্ত্রীলোকটী আরাম হইল। তখন তাহার নিকট জানা গেল যে, সেই দিন প্রাতে সে ঘরে গোময় দিতে ছিল, হঠাৎ তাহার বোধ হইল তাহার পায়ের গোড়ালিতে যেন কিসে দংশন করিল। সে ফিরিয়া দেখে যে একটী সাপের ছানা, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদদলিত করিল। তাহার পর, সে এ কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটীর নিকট এই কথা শুনিয়া, অনুসন্ধান করিয়া সেই সাপের ছানাটী পাওয়া গেল, এবং দেখা গেল যে ইহা একটী গোক্ষুরার ছানা এবং তাহার বয়স এক দিনের বেশী হইবে না।

সর্পের একটী ছানা দেখিতে পাইলে, তখনই তাহার সঙ্গীদের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কর্ত্তব্য। যদি ইহারা খুব শৈশব হয়, তবে তাহার ভ্রাতা ভগ্নীগণকে ইহার নিকটেই পাওয়া যাইবার সম্ভব। মালবৈদ্যেরা কখনই সাপ মারিয়া ফেলে না। এই সর্প দ্বারাই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং সাপ মারা তাহারা অন্যায় কার্য্য মনে করে। সেই জন্য সাপের ছানা দেখিতে পাইলেই, তাহারা হাঁড়ীর মধ্যে পূরিয়া দূরে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আসে।

এক একটী সর্পের গড়ে কুড়িটী করিয়া ডিম প্রসব করে। এই সমস্ত ডিম হইতে যে ছানা হয়, তাহা যদি সমস্ত বাঁচিয়া থাকিত, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবী সর্পে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ডিম হইতে ছানা বাহির হইলেই বড় বড় সর্প তাহাদিগের অনেক গুলি খাইয়া ফেলিয়া দেয়।

ভেক, বিড়াল ও বেজিও তাহাদিগের বড় শত্রু। ইহারাও সাপের ছানা অনেক নষ্ট করিয়া ফেলে। একটী সাপ মারিয়া ফেলা অপেক্ষা একটি সাপের সমস্ত ডিম নষ্ট করা অধিক সহজ। সুতরাং সর্পের ডিম নষ্ট করিবার জন্য যদি গবর্ণমেণ্ট পুরস্কারের বন্দোবস্ত করেন, তবে অধিক ফলপ্রদ হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কানড় সাপ ঘরের চালে বাস করে। অনেক সময় কানড় সাপের ছানা এক একটী করিয়া চাল হইতে মাটিতে পড়িতে দেখা যায়। এই ছানার বিষ বড় কানড়ের বিষের ন্যায় সমান তেজস্কর, সুতরাং ইহারাও খুব বিপদজনক। গোক্ষুরার ছানা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা অতিশয় দুর্ব্বল এবং একটু আঘাত পাইলেই মরিয়া যায়। ইহারা কাহাকে ভয় করিতে শিখে নাই, অকুতোভয়ে যেখানে সেখানে চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছে, মনুষ্য নিকটবর্ত্তী হইলে ভ্রুক্ষেপও করিতেছে না। লাঠি দিয়া তাহাকে স্পর্শকর, অমনি সে রাগত হইয়া ফণা তুলিবে, কি তোমার দিকে ধাবিত হইবে। ছেলে বেলা এক দিন আমি দৌড়িতেছি, হঠাৎ আমার পা একটী গোক্ষুরার ছানার গায়ে লাগিল। সে অমনি ফণা তুলিয়া আমাকে ছোঁ মারিল। আমি দৌড়িতেছিলাম বলিয়া সে লক্ষ্যচ্যুত হইল, কিন্তু সে খানিক দূর পর্য্যন্ত আমার পশ্চাদ্গামী হইল, এবং শেষে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সর্পভীতি নিবারণের উপায়।

গোক্ষুরা সর্প আহার অন্বেষণার্থে কথন কখন গৃহে প্রবেশ করে। কানড় সর্পও মনুষ্যের সংসর্গে সর্ব্বদা থাকে। ইহারা ভিন্ন, কেউটা, পাতরাজ, বোড়া, শাখনি প্রভৃতি আর কোন বিষাক্ত সর্প মানব নিবাসের নিকটে আসে না। সুতরাং গোক্ষুরা ও কানড় হইতে গৃহস্থদিগের প্রধান ভয়। এই দুই জাতীয় সর্প যাহাতে গৃহে না আসিতে পারে, আমাদের তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। যে গৃহে ছুঁচো কি ইন্দুরের বেশী প্রাদুর্ভাব, সেইখানেই গোক্ষুরা সর্প প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে ছুঁচো ও ইন্দুর ঘরে না থাকিতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বিড়াল, কুকুর ও বেজি সর্পের প্রধান শত্রু। বেজিদের একটী খারাপ অভ্যাস আছে। তাহারা সর্পকে আহত করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসে। কিন্তু যেরূপ কুকুর বাড়িতে থাকিলে চোর আসিতে পারে না, সেইরূপ বেজি বাড়ীতে থাকিলেও সর্পের ভয় থাকে না। কুকুরেরা সর্প দেখিলে ডাকিতে থাকে, কিন্তু আক্রমণ করে না। তবে তাহাদের ডাক শুনিয়া গৃহস্থেরা সতর্ক হইয়া যায়। বিড়ালেরা কিন্তু সর্প দেখিবামাত্রই আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়। সর্প ও বিড়ালের যুদ্ধ দেখিতে বড় চমৎকার। কিন্তু ইহা আমোদের যুদ্ধ নহে,

ইহাতে একজনের কি উভয়েরই জীবন নাশ হয়। শৃগালেরাও সর্পের সহিত যুদ্ধ করে, এবং কখন কখন এই যুদ্ধে উভয়েই মারা পড়ে।

বেজি ও সর্পের যুদ্ধ এত সাধারণ যে, ইহা হইতে একটী প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে কথায় বলিয়া থাকে, "সাপে নেউলে ঝগড়া।" বেজিরা সর্প দেখিলেই আক্রমণ করে। সাধারণ লোকের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস যে, বেজিরা সর্পবিষের অব্যর্থ ঔষধ জানে। কিন্তু কখন কখন বেজিকেও এই যুদ্ধে মরিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায় যে, অন্ততঃ সকল বেজী এই ঔষধ জানে না। হাড়গিলা পক্ষীও সর্পের ভয়ানক শত্রু। ইহারা সর্প মারিয়া খাইয়া ফেলে। অন্যান্য শীকারী পক্ষীরাও সর্প বধ করিয়া গলাধঃ করিয়া থাকে। সর্পেরা এই সকল পক্ষীর সঙ্গে কিছুতেই পারিয়া উঠে না।

ইন্দুর ও ছুঁচো যাহাতে গৃহে না থাকিতে পারে, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। আর মুরগী, হাঁস কি পায়রা বাসগৃহ হইতে দূরে রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সর্পেরা নিজে গর্ত্ত খুঁড়িতে পারে না, তাহারা গর্ত্ত পাইলেই তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। সুতরাং সর্প কোন গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলে, যদি তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সর্প আর বাহির হইতে পারে না, কাজেই উহার মধ্যে মরিয়া থাকে।

গোক্ষুরা সর্প রাত্রে গৃহে প্রবেশ করিয়া আহার অন্বেষণ করে, এবং প্রাতঃকাল হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। কিন্তু যদি দরজা জানালা সকল উত্তমরূপে বন্ধ থাকে, এবং গৃহে

কোন ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে সর্প কখনই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। কখন কখন এরূপ হয় যে সর্প একটী গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সে বাহির হইবার পূর্ব্বেই সকাল হইয়া গিয়াছে, কাজেই সে আর বাহির হইতে পারে নাই, গর্ত্তের মধ্যেই থাকিয়া গিয়াছে। আর, গর্ত্তটী যদি তাহার মনোমত হয়, এবং কেহ তাহাকে উৎপীড়ন না করে, তবে সে সেখানেই থাকিয়া যায়। ক্রমে তাহার একটী সঙ্গী যুটিল। তখন স্ত্রী সর্পটী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিল, এবং ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

গৃহের মধ্যে গর্ত্ত ও দেওয়ালে ফাটা থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। ইহাতে বিশেষ কোন খরচ নাই, সুতরাং গরীব লোকের পক্ষেও গর্ত্ত ও ফাটা বন্দ করা সহজ। ইন্দুর ও ছুঁচো গৃহ হইতে বিতাড়িত করাও কঠিন ব্যাপার নহে। ইহাই করিতে পারিলে গোক্ষুরা সর্প হইতে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়। কিন্তু কানড় সর্প গৃহ হইতে দূর করা কিছু শক্ত। একে তাহারা মনুষ্যের সংসর্গেই বাস করে। তাহার পর, তাহারা টিকটিকি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা মাকড় ধরিয়া আহার করে; আর এই সকল পোকা মাকড় গরীব লোকের ঘরেই বেশী থাকে। সুতরাং গরীব লোকদিগের ঘরেই কানড় সর্পের প্রাদুর্ভাব বেশী। তবু ঘর হইতে এই সর্প তাড়াইবার এক সহজ উপায় আছে। ইহাদের ঘ্রাণশক্তি অতি তীব্র, আবার ইহারা ধূমা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং সর্প যদি ঘরে থাকে, তবে গন্ধক কি অন্য কোন দুর্গন্ধময় দ্রব্য পোড়াইলেই তাহার গন্ধে ও ধূমার জন্য সর্প আপনা হইতেই চলিয়া যায়। যদি ঘরে গর্ত্ত থাকে,

তবে ঐ গর্ত্তের মুখের কাছে গন্ধক রাখিয়া পোড়াইবে। গর্ত্তে যদি সর্প থাকে, তবে এই গন্ধকের গন্ধে সে বাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং যদি কোন ঘরের গর্ত্তের মধ্যে সর্প থাকা সম্ভবপর হয়, তবে রাত্রে ঐ গর্ত্তের মুখে গন্ধকের ধূমা দিয়া রাখিবে, এবং পরদিন প্রাতে গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। যদি গর্ত্তের অনেকগুলি মুখ থাকে, তবে এক মুখে গন্ধকের ধূমা দিয়া, ঐ মুখ বন্ধ করিয়া দিলে সর্প অন্য কোন মুখ দিয়া গর্ত্তের মধ্যে যাতায়ত করিতে পারে। সুতরাং ঐরূপ স্থলে গর্ত্তে ধূমা দিলে সকল সময় ফল পাওয়া যায় না।

ঘরের চালে এবং দেওয়ালের উপরেই কানড় সর্পেরা প্রায় থাকে। এই সকল স্থলে খুঁজিলেই অনেক সময় তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল ঘরের মধ্যে মধ্যে গন্ধকের কি অন্য কোন তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্য পোড়াইয়া ধূমা দিলেই, কানড় সর্প আর থাকিতে পারে না।

সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইবার আরও কতকগুলি উপায় আছে। যথা,—ঘরে চাঁদোয়া খাটান, মশারি ব্যবহার করা, এবং খাট, তক্তপোষ, কি খাটিয়ার উপর শয়ন করা।

নিম্ন বঙ্গদেশ ভিন্ন আর প্রায় সকল দেশেই গরীব লোকে খাটিয়া ব্যবহার করে, এবং এইজন্য অনেক সময় তাহারা সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আছে। বিশ্বকর্ম্মা প্রথম খাটিয়া তৈয়ার করিয়া সর্প জাতিকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই খাটিয়ার উপর যতক্ষণ লোকে শয়ন করিয়া থাকিবে, ততক্ষণ তাহাদিগকে দংশন করিতে পারিবে না।

গৃহের মধ্যে কেবল গোক্ষুরা ও কানড়ের আশঙ্কা, কিন্তু ঘরের বাহিরে, পথে ঘাটে মাঠে, পাতরাজ জাতীয় ভিন্ন আর সকল প্রকার সর্পেরই আশঙ্কা আছে। রাত্রে একটু সাবধান হইয়া যাতায়াত করিলে, সর্পের কোন ভয় থাকে না। যাহারা রাত্রে জুতা মোজা ব্যবহার ও আলো লইয়া চলাফেরা করে, তাহাদিগের আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই; কিন্তু গরীব লোকের পক্ষে জুতা মোজা ব্যবহার কি লাণ্ঠন লইয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করা সম্ভবপর হয় না। অনেকে রাত্রে বেড়াইবার সময় লাঠি লইয়া ঠক্‌ঠক্ শব্দ করিতে করিতে যায়। এই শব্দে অনেক সময় সর্প নিকটে থাকিলে সরিয়া যায়, এবং আক্রমণ করিলেও লাঠির সাহায্যে লোকে আত্মরক্ষা করিতে পারে। অনেক সময় লাঠির অভাবে লোকে হাততালি দিতে দিতে গমন করে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, এই শব্দে সর্প পলাইয়া যায়। কখন কখন হাত-তালির শব্দে সর্প সরিয়া যায় সত্য, কিন্তু অনেক সময়, বিশেষতঃ বেশী গরম পড়িলে, তাহারা শব্দ শুনিয়াও পথ হইতে নড়ে না, বরং আত্মরক্ষার্থ ফণা তুলিয়া আগমনকারীর প্রতীক্ষা করে।

শীতকাল সর্পের প্রিয় নহে, আবার অতিশয় গরমও তাহারা ভাল বাসে না। গ্রীষ্মকালে সর্পেরা বড় চলাফেরা করে না, গরমের জন্য পথে ঘাটে অলস ভাবে পড়িয়া থাকে। আমরা এরূপও দেখিয়াছি যে, সর্প পথের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, নানারূপ শব্দ করাতেও নড়িতেছে না। শেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে মারিতে কি লাঠি দিয়া দূরে

নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই যে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি তাহার নিকটে যাও, দেখিবে, সে অমনি ফোঁস্ করিয়া ছোঁ মারিবে। অনেক সময়, যখন গরমে বেশী নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, তখন নিকটে গেলে কি তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলেও, সে কিছুই বলিবে না।

অতিশয় গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টি হইয়া গেলে, সর্পের ভয় বেশী হয়। গরমের পর বৃষ্টিজনিত ঠাণ্ডা পাইয়া সর্পেরা সতেজ হয়, এবং গর্ত্ত সকল বৃষ্টির জলে পূরিয়া যাওয়ায়, সমস্ত সর্পই বাহিরে আসিতে বাধ্য হয়। বাহিরে আসিয়া তাহারা সতেজ শরীরে মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়ায়। এই সময় রাত্রে যাতায়াত করা বড় বিপদজনক। আবার বেশী বৃষ্টি হইলে সর্পেরা ঘরের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

সর্প দংশন করিবামাত্র, তাহাকে ঝাড়া দিয়া দূরে নিক্ষেপ করা উচিত। এরূপ করিতে পারিলে সর্প দষ্টস্থানে বিষদাঁত হইতে বিষ ঢালিয়া দিবার সময় পায় না। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত লিখিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষ ও বিষদন্ত।

মালবৈদ্যেরা পাতরাজ প্রভৃতি ফণাধারী সর্প ধরিয়াই প্রায় তাহাদের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দেয়। তবে গোক্ষুরা ও কেউটার বিষদাঁত অনেক সময় তাহারা আদপে ভাঙ্গে না। মালবৈদ্যেরা এই বিষদাঁত ভাঙ্গাকে "কামান" বলে। সর্পকে কামাইয়া দিলে, সে ভাল করিয়া আহার করে না, সুতরাং বেশী দিন বাঁচেও না। সর্প না কামাইয়া, তাহাদিগকে লইয়া নাড়াচাড়া করা খুব আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু মালবৈদ্যেরা শৈশব হইতে ইহাতে এরূপ অভ্যস্থ হয় যে, সর্প তাহাদিগকে প্রায় দংশন করিতে পারে না, এবং করিলেও তাহারা ইহা বড় গ্রাহ্য করে না। তাহাদের চিকিৎসা যে অব্যর্থ তাহার একটী প্রধান প্রমাণ এই যে, তাহারা সর্পের দন্ত না ভাঙ্গিয়াও অনায়াসে তাহাদের সহিত খেলা করে।

মালবৈদ্যেরা কেউটা, বিশেষতঃ কালকেউটা, প্রায় কামায় না। কারণ বৈদ্যগণ এই কেউটার বিষ ঔষধার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, কালকেউটার বিষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। কেউটা ভিন্ন অন্য কোন সর্পের বিষ তাঁহারা কখনই ব্যবহার করেন না। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, কেউটার বিষ সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। ইহা কতদূর সত্য

তাহা বলিতে পারি না। তবে গোক্ষুরা অপেক্ষা কেউটার দংশন যে অধিক মারাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। গোক্ষুরা অপেক্ষা কেউটা আকারে বড়, সুতরাং তাহাদের দন্তও বড় হয়। সেই জন্যই বোধহয় কেউটার দংশন অধিক সাংঘাতিক। ফণাবিহীন সর্প অপেক্ষা ফণাধারী সর্পের বিষ যে অধিক তীব্র এ সম্বন্ধে পরে বিস্তার করিয়া বলিব।

পাতরাজ জাতীয় সর্প, কি বৃহদাকার গোক্ষুরা ও কেউটা, কামাইবার সময় এক জনের অধিক লোকের আবশ্যক হয়। তবে সর্প ছোট হইলে এক জনেও কামাইয়া দিতে পারে।

সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিবার প্রণালী এই। একজন দাঁড়াইয়া, প্রথমে বাম হস্তের দ্বারা সর্পের ফণা ও বাম পদ দ্বারা উহার লেজ চাপিয়া ধরিয়া, সর্পটীকে লম্বা করিয়া রাখে। তাহার পর, বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সর্পের ফণা চাপিয়া ধরিয়া, উহার বিষদন্ত মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলে। এবং শেষে দক্ষিণ হস্তে একখানি তীক্ষ্ণ অস্ত্র লইয়া সর্পের বিষদন্ত গুলি বিষকোষ সহ তুলিয়া ফেলিয়া দেয়।

প্রত্যেক সর্পের ছয়টী করিয়া বিষদন্ত আছে, ইহার মধ্যে দুইটী বড় ও কার্য্যক্ষম, এবং ইহা দ্বারাই তাহারা দংশন করে। অপর চারিটী দেখিতে ঠিক বড় দন্ত দুইটীর ন্যায়, তবে আকারে ছোট। ইহার মধ্যে কোন কোনটী আবার এত ছোট যে সহজে দেখা যায় না। এই ছোট দাঁতগুলি এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত যে, বড় দাঁত দুইটীর মধ্যে যদি একটী কি দুইটীই নষ্ট হইয়া যায়, তবে ঐ ছোট দাঁত ক্রমে বড় ও কার্য্যক্ষম হইয়া বড় দাঁতের স্থান অধিকার করে। এই ছয়টী

দাঁত তুলিয়া ফেলিতে পারিলে, সর্পের আর বিষদাঁত উঠে না, সুতরাং তাহারা আর কখনই সাংঘাতিক দংশন করিতে পারে না। সর্পকে কামাইবার সময় যদি ভুলক্রমে ইহার একটী ছোট দাঁতও থাকিয়া যায়, তবে ঐ দাঁতটী বড় হইয়া সাংঘাতিক দংশনোপ-যোগী হয়। বড় দাঁত দুটী আলপিনের ন্যায় সরু, এবং দেখিতে অনেকটা বিড়ালের নখের মত।

ডিম হইতে বাহির হইবার সময় সর্পের এই ছয়টী দাঁতই থাকে। যখন এক দিনের ছানাও দংশন করিতে পারে ও এই দংশন সাংঘাতিক হয়, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, জন্মাবধিই সর্পের দংশনোপযোগী দুইটী দাঁত ও বিষকোষ থাকে।

এই ছয়টি বিষদাঁত ভিন্ন সর্পের স্বাভাবিক দাঁত অনেক গুলি আছে। বিষদাঁত গুলি উপরের পাটিতে ঠিক মধ্যস্থলে আছে, আর স্বাভাবিক দাঁত গুলি বিষদাঁতের দুই পার্শে ও নিচের পাটিতে অবস্থিত। এই স্বাভাবিক দাঁত গুলি দেখিতে ঠিক বিষদাঁতের ন্যায়, তবে উহা অপেক্ষা ছোট। বিষদাঁত গুলি দংশন করিবার জন্য, এবং স্বাভাবিক দাঁত গুলি আহারীয় দ্রব্য ধরিবার জন্য, ব্যবহৃত হয়। বিষশূন্য সাপের বিষদাঁত নাই, তাহাদের সমস্তই স্বাভাবিক দাঁত। কোন্ সাপ বিষাক্ত, কোন্ সাপ অবিষাক্ত, তাহা দাঁত দেখিলেই ঠিক করা যায়। মালবৈদ্যরা কোন নূতন সাপ পাইলে ইহা বিষাক্ত কি না, স্থির করিবার জন্য সাপের দাঁত পরীক্ষা করিয়া দেখে। বিষাক্ত সাপে যখন আহারীয় বস্তু ধরে, তখন স্বাভাবিক দাঁত দিয়াই উহাদিগকে কামড়াইয়া ধরে। তবে বোধহয় বিষদাঁতও উহাতে গায়ে বসিয়া যায়। আবার, সাপে বিষ-

দাঁত দিয়া দংশন করিবার পর যখন কামড়াইয়া ধরে, তখন এই বিষদাঁতের ছিদ্রের নিচে ও পার্শ্বে এই স্বাভাবিক দাঁতের কতকগুলি দাগ পড়িয়া যায়। এই কারণে অনেক সময় বিষদাঁতের দংশন স্বাভাবিক দাঁতের কামড় হইতে বিভিন্ন করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সর্পকে কামাইবার সময় বিশেষ সতর্কতার আবশ্যক। কারণ, যদি ভুলক্রমে একটি ছোট বিষদাঁত থাকিয়া যায়, তবে উহা ক্রমে বড় হইয়া অনেক সময় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

এরূপ ভুল হইবারও কারণ আছে। সর্পের যদিও ছয়টি বিষদাঁত, কিন্তু সকল সময় সব গুলিই পাওয়া যায় না। সর্পের দাঁত নানা কারণে ভাঙ্গিয়া যায়, সুতরাং কখন কখন কামাইবার সময় দেখা যায় যে, কাহার ছয়টি ও কাহার বা পাঁচটি বিষদাঁত রহিয়াছে। কোন মালবৈদ্য কামাইবার সময় একটি সাপের পাঁচটি দাঁত দেখিতে পাইল। সে ভাবিল আর একটি দাঁত বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, সেটি অতি ক্ষুদ্র বলিয়া, মালবৈদ্য উহা দেখিতে পায় নাই। এইরূপে কখন কখন একটি ছোট বিষদাঁত থাকিয়া যায়, এবং অনেক সময় ইহাতে বিপদ ঘটে।

মনে কর, ভুলক্রমে একটি ছোট দাঁত তোলা হয় নাই। ক্রমে এই দাঁতটি বড় হইয়া দংশনোপযোগী হইয়াছে, কিন্তু মালবৈদ্য তাহা জানিতে পারে নাই। খেলাইবার সময় হঠাৎ সাপ মালবৈদ্যকে ছোঁ মারিল, সে তাহা গ্রাহ্য করিল না, কারণ তাহার মনে বিশ্বাস যে সর্পের সমস্ত বিষদন্তই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। ক্রমে দষ্টব্যক্তির রক্তের সহিত বিষ সমস্ত শরীরে

প্রবেশ করিল। শেষে তাহার অবস্থা যখন খারাপ হইয়া পড়িল, তখনই জানা গেল যে সর্পের বিষদন্ত আছে, এবং সে তদ্দ্বারা সাংঘাতিকরূপে দংশন করিয়াছে। কিন্তু তখন রোগীর মুমূর্ষাবস্থা হইয়াছে, এবং সম্ভবতঃ তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল।

আমাদের সম্মুখে একদিন একজন মালবৈদ্যকে একটি সর্পে দংশন করে। এটি কেউটা সর্প, এবং আকারে সাধারণ গোক্ষুরা অপেক্ষা অনেক বড়। তবে ইহা অপেক্ষাও বড় কেউটা আমরা দেখিয়াছি। মালবৈদ্যের বিশ্বাস ছিল যে, সাপটির ছোট বড় সব বিষদাঁতই তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু সাপটি যে ভাবে দংশন করিল, তাহাতে মালবৈদ্যের সন্দেহের উদয় হইল; এবং তৎক্ষণাৎ বিষ বাহির করিয়া ফেলিয়া, সে ব্যক্তি বাঁচিয়া গেল। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, সর্পটীর একটি বিষদন্ত রহিয়া গিয়াছে।

উপরে বলিয়াছি মালবৈদ্যেরা সর্পকে কামাইবার সময় বিষদন্ত গুলি বিষকোষ সহ তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। বিষাক্ত সর্প মাত্রেরই দুইটী করিয়া বিষকোষ আছে। ইহা ঠিক বিষদন্তের ভিত্তিভূমিতে অবস্থিতি। এই কোষদ্বয়ে বিষ সঞ্চিত হয়। ইহা চক্ষের ঠিক নিম্নে মুখের মধ্যে সন্নিবেশিত। বিষদন্ত গুলিও চর্ম্মাবৃত। ইহারা সাধারণত তালুর গায়ে লাগিয়া থাকে। সর্প ক্রুদ্ধ হইলেই বড় দন্তদ্বয় সোজা হইয়া বিড়ালের নখের ন্যায় চর্ম্মকোষ হইতে বাহির হয়। এই বিষদন্তের মধ্য দিয়া ছিদ্র আছে। কোষ হইতে বিষ নির্গত হইয়া এই ছিদ্রের মধ্য দিয়া দষ্টস্থানে পতিত হয়। যখন দাঁত তালুর গায়ে

লাগিয়া থাকে, তখন বিষকোষের মুখ বন্দ থাকে। দন্তদ্বয় সোজা হইবামাত্র কোষের মুখ খুলিয়া যায়।

দন্তগুলি এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত করা যে, বিষ কেবল উহাদের মধ্য দিয়াই বাহির হইতে পারে। সুতরাং সর্প ছোঁ মারিলেই কোষ হইতে খানিক বিষ দাঁতের ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এইরূপে উপর্য্যুপরি ছোঁ মারিতে থাকিলে, প্রত্যেক বারে খানিক করিয়া বিষ নির্গত হয়। কিন্তু প্রথম বার ছোঁ মারাতে যে পরিমাণে বিষ বাহির হয়, দ্বিতীয় বারে তদপেক্ষা কম হয়, তাহার পর প্রত্যেক ছোঁতে বিষের পরিমাণ ক্রমে কমিয়া আসে, এবং শেষে সর্পের কোষ একরূপ বিষশূন্য হয়। কিন্তু ছোঁ মারা বন্দ করিলে অল্পক্ষণ পরেই কোষে আবার বিষ সঞ্চিত হইতে থাকে।

সর্পের তীব্র বিষ অতি অল্প মাত্রায় রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহাও মারাত্মক হয়। তবে বিষের পরিমাণ অনুসারে, যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ গুলির প্রকাশ এবং বিষের গতি ও কার্য্য, কম বেশী হয়। প্রথম বারের দংশনে শরীরের যন্ত্রণা যত বেশী ও বিষের কার্য্য যত ত্বরিত হইবে, পর মূহূর্ত্তেই পুনরায় দংশন করিলে, (বিষের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায়), উপসর্গের প্রকাশ ও বিষের ক্রিয়াও তদপেক্ষা কম হইবে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে দংশন করিতে থাকিলে, বিষের পরিমাণ যেরূপ কমিয়া আসিবে, উহার ক্রিয়াও সেইরূপ কমিবে। শেষে কোষ একেবারে বিষশূন্য হইলে, দংশন করিলেও আর শরীরে বিষ প্রবেশ করিবে না, সুতরাং উহা মারাত্মকও হইবে না।

সর্পবিষ তৈলবৎ সামগ্রী, কিন্তু দেখিতে ঠিক মধুর ন্যায়। ইহার আস্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, এত তিক্ত যে এক ফোঁটা মাত্র জিহ্বায় দিলে সারাদিন মুখ তিক্ত থাকে। ইহা অল্প পরিমাণে খাইলে কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মাথাধরা, গা বমিবমি, মস্তকে রক্তাধিক্য এবং চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রভৃতি নানা প্রকার কষ্টদায়ক উপসর্গ উপস্থিত হয়। সর্পবিষ ভক্ষণ করিয়া অনেকে লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করেন, কিন্তু উহা ভক্ষণে জীবনের কোন ভয় নাই। কিন্তু যদি একবিন্দু বিষ কোন প্রকারে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, তবে তাহার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত।

কবিরাজদিগের ব্যবহারের জন্য কি প্রকারে বিষকোষ হইতে সর্পবিষ বাহির করা হয়, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে সর্প দংশন করে, এবং কিরূপেই বা বিষদন্তের ছিদ্র দিয়া বিষ নির্গত হয়। উপরে বলিয়াছি যে, কবিরাজেরা কেবল কেউটা সর্পের বিষ ব্যবহার করেন। তাঁহাদের ব্যবহারের জন্য নিম্ন লিখিত উপায়ে সর্প-বিষ বাহির করা হয়। প্রথমে, একজন বামহস্ত দ্বারা সর্পের মাথা চাপিয়া ধরে, তাহার পর একখানি ঝিনুকের কিয়দংশ তাল-পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, উহার মুখের ভিতর জোর করিয়া পূরিয়া দেয়। ঝিনুক মুখের মধ্যে পূরিয়া দিবার সময় সর্প ক্রোধ করিয়া মাড়ি চাপিয়া ধরে, সুতরাং দন্তদ্বয় সোজা হইয়া তালপত্র ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। বিষকোষের মুখও সেই সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া যায়, এবং দন্তের মধ্য দিয়া ধারা বাহিয়া বিষ ঝিনুকে পড়িতে থাকে। প্রথম দুই এক

সেকেণ্ড এইরূপ ধারা বাহিয়া পড়িয়া, ক্রমে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িতে থাকে, এবং শেষে তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। ইহা-তেই বুঝা যায় যে, কোষ বিষশূন্য হইয়া গিয়াছে।

তখন উক্ত ঝিনুক বাহির করিয়া দেখা যায় যে, ৩।৪ কাঁচ্চা পরিমাণ বিষ উহাতে পড়িয়াছে। ইহার এক ফোঁটা বিষ গায়ে ঘষিলে, সাবানের ফেণার ন্যায় লাগিয়া যাইবে। বৈদ্যগণ ঔষধার্থে ব্যবহার করিবার জন্য বিষ সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া লয়েন। শুষ্ক হইলে উহা পেষণ করিয়া চূর্ণ করা যাইতে পারে। মালবৈদ্যেরা বলে যে, বিষ বাতাসে রাখিলে উহার তেজ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়।

ঝিনুকাচ্ছাদিত তালপত্র খানি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে সর্পের দন্তাঘাতে দুইটী অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র হইয়াছে। এই ছিদ্রদ্বয়ের ব্যবধান অর্দ্ধ কি সিকি ইঞ্চি হইবে। সর্পের দন্ত হইতে ঝিনুকে যখন বিষ ধারা বাহিয়া পড়িতে থাকে, তখন ইহার গতি নিরীক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, বিষ একেবারে অধিক পরিমাণে নির্গত হয় না। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দংশনের সময় অতি সামান্য মাত্রায় বিষ দষ্টব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। তাহার পর, দষ্টব্যক্তি সর্পকে তাহার শরীরের মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ ঢালিয়া দিতে দিবে কেন? বরং দংশন করিবামাত্র সে দষ্ট অঙ্গ টানিয়া লইবে, কি সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবে।

সর্প কামান হইলে তাহার ভগ্নদন্ত গুলি সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আমরা সর্পের কয়েকটী ক্ষুদ্র দন্ত অনু-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। উহাদের আকার

ঠিক বৃহৎ দন্তের ন্যায়। উপরে বলিয়াছি যে, সর্পের দন্তের মধ্য দিয়া ছিদ্র আছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে, এই ছিদ্র দন্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। এই ছিদ্রের মধ্যে সূক্ষ্ম চুল প্রবেশ করাইয়া দিলে দেখা যাইবে যে, ইহা দন্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত না যাইয়া মধ্যস্থল হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। এটী অতি আবশ্যকীয় কথা, এবং সকলেরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত। শ্রীভগবান সর্পদন্তের এইরূপ গঠন করিয়া, জীবগণকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা পাইবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিয়াছেন। কারণ, ছিদ্র যদি দন্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক দংশনেই শরীরে বিষ প্রবেশ করিত, এবং সর্পদংশন শতগুণ অধিক মারাত্মক হইত।

গোক্ষুরা, কেউটা, পাতরাজ প্রভৃতি প্রায় সকল ফণাযুক্ত সর্পের বিষই অতি তীব্র। উলুবোড়া বা পচাবোড়া ফণাবিহীন। ইহাদের দন্ত সর্ব্বপ্রকার ফণাধারী সর্পের দন্ত হইতে বড়। উলুবোড়া বা পচাবোড়া দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা মনুষ্য নিবাস হইতে অনেক দূরে, মাঠে, বাস করে। ইহাদের দংশন গোক্ষুরা সর্পের দংশন হইতেও সাংঘাতিক; কারণ ইহাদের দন্ত অতিশয় লম্বা, সুতরাং ইহাদের দংশনও অধিক গভীর। ইহাদের দংশনে দষ্টস্থান পচিয়া যায় বলিয়া ইহাদিগকে পচাবোড়া বলে।

পাতরাজ জাতীয় সর্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর। কারণ, ইহাদের বিষ অতিশয় তীব্র এবং বিষকোষও বড়। আবার ইহাদের দন্তও উলুবোড়ার দন্তের ন্যায় বড়। পাতরাজ সর্প উলুবোড়া অপেক্ষা চতুর্গুণ, আর কেউটা অপেক্ষা দ্বিগুণ বড়।

উলুবোড়ার দংশন গভীর হইলেও ইহাদের বিষ অতি ধীরে ধীরে ব্যাপিত হয়, কিন্তু পাতরাজ জাতীয় সর্পের দংশন যেমন গভীর, ইহাদের বিষও সেইরূপ তীব্র ও ত্বরিতব্যাপী।

পঞ্চম অধ্যায়।

দংশন।

সর্পে দংশন করিলেই যে মারাত্মক হয়, কি দষ্ট-ব্যক্তির শরীরে বিষ প্রবেশ করে, তাহা নহে। কখন কখন দেখা যায় যে, সর্পের দংশনে সামান্য একটু ছাল উঠিয়া গিয়াছে, কখনবা সূচের অগ্রভাগ দ্বারা টানিয়া আনিলে যেরূপ আঁচড় পড়ে, সেইরূপ দুটী দাগ পড়িয়াছে। সেইজন্য মাল-বৈদ্যেরা সর্পদংশনকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে, যথা—ছোল, টান ও টিপ।

সর্পে ছোঁ মারিয়াছে, আর ঠিক সেই সময় লক্ষ্যস্থান সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং হয়ত ছোঁ আদপে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করে নাই, কিম্বা চর্ম্মের উপর দন্তাগ্রের সামান্য আঘাত লাগিয়াছে, এবং ঐ স্থান হইতে অল্পমাত্র ছাল উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ সামান্য একটু ছাল উঠাকে "ছোল" কামড় বলে। ইহাতে দষ্টস্থানে বিষ পড়িতে পারে না। কারণ ছোঁ মারিবার সময় লক্ষ্যস্থান সরাইয়া লওয়ায়, ছোঁ অন্যস্থানে পড়ে, সুতরাং বিষও সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যস্থানে পড়িয়া যায়। "ছোল" কামড়ে প্রাণের কোন ভয় নাই

কিন্তু কখন কখন ছোঁ মারিবার সময় লক্ষ্যস্থান তাড়াতাড়ি সরাইতে পারা যায় নাই। ইহাতে সর্প ছোঁ মারিয়া লক্ষ্যস্থানে

দন্ত বসাইবার সময় পাইয়াছে। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিও এদিকে ঝাড়া দিয়া, কি অতি ত্রস্তভাবে, সর্পের দন্ত হইতে দষ্টস্থান ছাড়াইয়া লইয়াছে। ইহাতে তীক্ষ্ণ সূচ্যগ্রের আঁচড়ের ন্যায় দষ্টস্থানে একটী কি দুইটী আঁচড় পড়িয়া গিয়াছে। ইহাকেই "টান" কামড় বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সর্পের দন্তের মধ্য দিয়া ছিদ্র আছে। সুতরাং দন্ত অধিক পরিমাণে শরীর ভেদ করিবার পূর্ব্বে, যদি দষ্ট অঙ্গ সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দষ্টস্থানে বিষ প্রবেশ করিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর ছোঁ মারিবার সময় বিষকোষ হইতে যে বিষ বাহির হইবে, তাহা দষ্টস্থানে না পড়িয়া অন্যস্থানে আসিয়া পড়িবে। এই "টান" কামড়ে অনবরত রক্ত পড়িতে থাকে; এবং ইহাতে জীবনের কোন আশঙ্কা নাই।

একমাত্র "টিপ" কামড়ই মারাত্মক। যখন সর্প দংশন করিয়া দাঁতের অর্দ্ধেকের বেশী দষ্টস্থানে বসাইতে পারে, তখন আর সহজে ছাড়িতে চাহে না, কামড়াইয়াই থাকে। এমন কি, বিশেষ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইতে হয়। ইহাকেই বলে "টিপ" কামড়।

মনে ভাব ক—গ—খ সর্পের একটী দন্ত। ক দন্তের গোড়া, খ অগ্রভাগ। ক হইতে গ পর্য্যন্ত দন্তের মধ্যে ফাঁপা, এবং গ-এর নিকট ছিদ্র আছে। বিষকোষ হইতে বিষ বাহির হইয়া দন্তের ফাঁপা অংশের মধ্য দিয়া গ-এর নিকট যে ছিদ্র আছে, তাহা দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে। যদি সর্প আপনার দন্তের, খ হইতে গ পর্য্যন্ত দষ্টস্থান ভেদ করিতে পারে, তবে দষ্টব্যক্তির শরীরে বিষ

প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু যদি তদপেক্ষা বেশী অংশ বসাইতে পারে, তবে বিষ শরীরে প্রবেশ করাইতে পারে।

"টিপ" কামড়ে দষ্টস্থানে সূচ্যগ্রের ন্যায় দুইটী, কখন বা একটী মাত্র, ছিদ্র দেখা যাইবে, এবং অতি সামান্য রক্ত পড়িতে থাকিবে। সর্পের যখন একটী দাঁত দংশনোপযোগী থাকে, তখন একটী ছিদ্র, এবং যখন দুইটী থাকে, তখন দুইটি ছিদ্র হয়। কিন্তু ছিদ্র একটী বা দুইটী হউক, এইরূপ দংশন যে মারাত্মক তাহাতে সন্দেহ নাই। সাপ যখন দাঁতের অনেক খানি শরীরে বসাইয়া কামড়াইয়া ধরে, তখন দষ্টস্থানের নিম্নে স্বাভাবিক দাঁতের দাগও পড়িয়া যায়। ফণাবিহীন, বিশেষতঃ কানড়, সর্পের দংশনেই এইরূপ চিহ্ন বেশী দেখা যায়।

"ছোল" ও "টান" কামড় মারাত্মক নহে, সুতরাং উহাতে চিকিৎসার আবশ্যক করে না। কেবলমাত্র "টিপ" কামড়েরই কোন প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন। অনেক সময় ঔষধ সেবন করাইয়া সর্পদংশনে উপকার হইতে দেখা যায়। কিন্তু ইহা প্রকৃত ঔষধের গুণ নহে, "ছোল" ও "টান" কামড়ে প্রয়োগ হয় বলিয়াই এরূপ উপকার বোধহয়। "টিপ" কামড়ে ঔষধ সেবন দ্বারা কোন প্রকার ফলপ্রাপ্ত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, শরীরে সর্পের বিষ যত শীঘ্র কার্য্য করে, ঔষধ সেবনে তত ত্বরিত কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াই উপরে উঠিতে থাকে, তখন ইহার গতি রোধ না হইলে, ইহা বরাবর ফুস্‌ফুসে গমন করে, এবং সেখানে যাইয়া তাহার কার্য্য বন্ধ করিয়া ফেলে। সুতরাং শরীরে বিষ প্রবেশ করিলে, ঔষধ ধরিতে না ধরিতে মনুষ্য মরিয়া যায়।

সর্পে দংশন করিয়াছে এ কথা উঠিলে, প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে সর্পে দংশন করিয়াছে কি না। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে যে, দংশন—ছোল, টান, কি টিপ। যদি ছোল কি টান কামড় হয়, তবে চিকিৎসার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু প্রকৃত সর্পে দংশন করিয়াছে কি না, ইহা ঠিক করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। সর্পের দংশনে যেমন জ্বালা ও চিন্‌চিন্ করে, বিছা কাঁকড়াবিছা ও ভিমরুলের দংশনেও ঠিক সেইরূপ করে। তবে সম্ভবতঃ ইহাদের দংশন অপেক্ষা সর্পের দংশন কম যন্ত্রণাদায়ক হইবে। কারণ, এরূপও দেখা গিয়াছে যে, রাত্রে কানড় সর্পে দংশন করিয়াছে, আর প্রাতে দষ্টব্যক্তি মুমূর্ষাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের দংশন কম যন্ত্রণাদায়ক বলিয়াই বোধহয় উহাতে দষ্টব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। কানড় অপেক্ষা গোক্ষুরার দংশন অধিক যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু গোক্ষুরার দংশনে দষ্টব্যক্তিকে এরূপ অসাড় করিয়া ফেলে যে, সে আপন শরীরে কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছে, তাহা সম্যকরূপে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। আবার কখন কখন কিসে যে দংশন করিল, তাহা রোগী ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। অনেক সময় চিকিৎসক রোগীর নিকট প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারে যে, কিসে দংশন করিয়াছে, কিন্তু কখন কখন ইহা আদপে ঠিক হয় না।

এরূপ অবস্থায়, রোগীকে সর্পে কি অন্য কিছুতে দংশন করিয়াছে, তাহা সাব্যস্ত করা কঠিন হইয়া পড়ে। কাঁকড়া-বিছার দংশনে একটী মাত্র ছিদ্র ও তেতুলে-বিছার কামড়ে দুইটী ছিদ্র হয়। আবার সর্পের দংশনেও কখন দুইটী, কখন বা

একটী মাত্র ছিদ্র হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকৃত কিসে দংশন করিয়াছে তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য রোগীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক। ইহাই ঠিক করিবার জন্য আমরা বিভিন্ন দংশনের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ বিবৃত করিতেছি।

বৃশ্চিকের দংশনে দষ্টস্থানে যে ছিদ্র হয়, তাহা সর্প দংশনের ছিদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং দংশনের একটু পরেই উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু বড় সর্পে দংশন করিলে যে ছিদ্র হয়, তাহা অনেকক্ষণ, অনেক সময় কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্তও, থাকিয়া যায়। বৃশ্চিক ও ভিমরুলের দংশনে দষ্টস্থান রক্তবর্ণ হয়, কিন্তু সর্পের দংশনে দষ্টস্থানের চতুষ্পার্শ্ব ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বা ঈষৎ নীলবর্ণ হইয়া যায়। আবার সর্পের "টিপ" কামড়ে দষ্টস্থান হইতে অল্প মাত্রায় রক্ত নির্গত হইয়া সেই স্থানেই শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু বৃশ্চিকের দংশনে অধিক পরিমাণে রক্ত পড়ে।

উপরে বলিয়াছি যে, সর্পদংশনে বিষদন্তের ছিদ্রের নিম্নে স্বাভাবিক দন্তাঘাতের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয়। এই স্বাভাবিক দন্তাঘাতে কখন অল্প কখন বা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইতে থাকে। বৃশ্চিকের স্বাভাবিক দন্ত নাই, সুতরাং তাহাদের দংশনে ঐরূপ হয় না। আবার সর্পদংশনে দষ্টস্থানের চারিপার্শ্বে সর্পের মুখের লাল লাগিয়া যায়, এবং এই লালা ক্ষণপরে শুখাইয়া দষ্টস্থানের চারিদিকে চক্‌চক্ করিতে থাকে। বৃশ্চিক কি অন্য কিছুর দংশনে এরূপ লালা লাগে না। তারপর, সর্পদংশন ব্যতীত অন্য সকল দংশনে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে ও সে ফুলা থাকিয়া যায়। সর্পে দংশন করিলেই সে স্থান ফুলিয়া উঠে বটে, কিন্তু উহা অল্পক্ষণ পরেই আবার মিলাইয়া যায়। এই সমস্ত

লক্ষণ পরীক্ষা করিয়াও যদি সন্দেহ দূরীভূত না হয়, তবে দষ্টস্থানে তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা চিরিয়া, ঐ স্থানের রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। দষ্টস্থানে যদি আদপে রক্ত না পাওয়া যায়, কি রক্ত বিবর্ণ দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয় সর্পে দংশন করিয়াছে। ফল কথা, সন্দেহ স্থলে, অর্থাৎ কিসে দংশন করিয়াছে তাহা ঠিক না হইলে, তখনই চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে। আর চিকিৎসা আরম্ভ হইলেই নিশ্চিত রূপে জানা যাইবে যে, দংশন সর্পের কি অন্য কিছুর।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষের গতি ও ক্রিয়া

উপরে বলিয়াছি যে, সর্পে দংশন করিবা মাত্র দষ্টস্থান ক্রমে ফুলিতে থাকে, কিন্তু একটু পরেই আবার ঐ ফুলা মিলাইয়া যায়। মালবৈদ্যেরা বলে যে, সর্প দংশন করিবামাত্র প্রথমে সিকির মতন, পরে আদুলির মতন, তাহার পরে টাকার মতন ফুলিবে, এবং শেষে ফুলা কমিতে থাকিবে।

যতক্ষণ বিষ ছিদ্রস্থান ছাড়াইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ এই ফুলা থাকিবে, এবং বিষ উঠিতে আরম্ভ করিলেই, ফুলা ক্রমে কমিয়া আসিবে। অর্থাৎ এইরূপ ফুলা থাকিলেই জানা যাইবে যে, বিষ এখনও দষ্টস্থানে আছে। আর ফুলা নাই দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, বিষ দষ্টস্থান ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। অর্দ্ধ-ঘণ্টা পরে ক্ষতস্থান আবার একটু ফুলিয়া উঠিবে। কিন্তু এ ফুলা বিষের জন্য নহে, শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে যে কারণে ফুলিয়া উঠে, এ সেই কারণের ফুলা।

বিষ শরীরে প্রবেশ করিবা মাত্র, উর্দ্ধে উঠিবার জন্য পথ অন্বেষণ করিতে থাকে। যদি প্রধান শিরা হইতে দূরে দংশন করে, তাহা হইলে বিষের পথ পাইতে দেরি হয়। কখন কখন ঠিক শিরার উপর দংশন করায়, দন্ত ঐ শিরা ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করে। এরূপ হইলে দংশন করিবা মাত্র বিষ

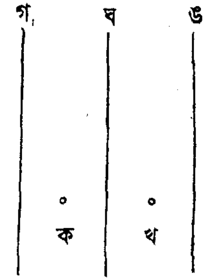
উপরে উঠিতে থাকে, এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষ শিরায় প্রবেশ করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে।

যদি সর্পের দুইটি বিষদন্ত থাকে, তবে দষ্টস্থানে দুইটী ছিদ্র হয়। এই ছিদ্রদ্বয়ের বিষ ভিন্ন ভিন্ন শিরা অবলম্বন করে। এইরূপে দুই বিন্দু বিষ দুইটি শিরা অবলম্বন করিয়া পাশাপাশি হইয়া উঠিতে থাকে। ইহার মধ্যে একটির গতি রোধ করিলেও অপরটি রোগীর প্রাণনাশ করিতে সক্ষম হয়। উপরে বলিয়াছি যে, দুই ছিদ্রের বিষ দুইটি শিরা দিয়া পাশাপাশি হইয়া উঠে। যখন উভয় দন্তাঘাত শিরার উপর কি শিরা হইতে সমদূরে পতিত হয়, তখনই দুইটি শিরা বাহিয়া ঠিক এক সময় বিষ পাশাপাশি হইয়া উঠে। কিন্তু যদি একটি দংশন শিরার উপর এবং অপরটী শিরা হইতে দূরে পড়ে, তবে শেষোক্ত দন্তাঘাতের বিষ শিরাতে যাইবার পূর্ব্বে, প্রথমোক্ত দন্তাঘাতের বিষ শিরা দিয়া দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে থাকিবে; এবং যদি ইহার গতিরোধ করা না হয়, তবে দ্বিতীয় ছিদ্রের বিষ শিরা খুজিয়া লইয়া দষ্টস্থান হইতে অল্প উঠিবার পূর্ব্বেই, প্রথম ছিদ্রের বিষ দ্বারা দষ্টব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দষ্টস্থান হইতে বিষ উপরে উঠিবার সময় এক নূতন নিয়ম অনুসারে শিরা বাছিয়া লয়। এই দুই ছিদ্রের দুই বিন্দু বিষ উপরে উঠিবার সময় দুইটি ভিন্ন ভিন্ন শিরা অবলম্বন করিবে। আবার বাম ছিদ্রের বিষ ঐ ছিদ্রের বামপার্শ্বের, এবং দক্ষিণ ছিদ্রের বিষ এই ছিদ্রের দক্ষিণের, শিরা অবলম্বন করিবে। এই দুই ছিদ্রের মধ্যভাগে যদি কোন শিরা পতিত হয়,

তবে কোন ছিদ্রের বিষই ঐ মধ্যস্থিত শিরা অবলম্বন করিবে না।

নিম্নে ইহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, সর্পে দংশন করিবার পর, দষ্টস্থানে ক খ এই দুইটি দষ্টছিদ্র দেখা যাইতেছে, ক-ছিদ্র বামে ও খ-ছিদ্র দক্ষিণে। গ ঘ ঙ এই তিনটী শিরা; গ-শিরা ক-ছিদ্রের বামে, ঙ-শিরা খ-ছিদ্রের দক্ষিণে, এবং ঘ-শিরা কখ-ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখন ক-ছিদ্রের বিষ উহার বামপার্শ্বস্থ গ-শিরা, এবং খ-ছিদ্রের বিষ উহার দক্ষিণ দিকস্থ ঙ-শিরা অবলম্বন করিবে। ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত ঘ-শিরা কেহই অবলম্বন করিবে না।



বিষ-বিন্দুদ্বয় এইরূপে আপনাপন শিরা বাহিয়া উপরে উঠিতে থাকিবে, এবং শেষে ফুস্‌ফুসে যাইয়া উহার ক্রিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিবে। যদি বিষ-বিন্দুদ্বয়ের গতি বাধা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা বরাবরই আপনাপন শিরা দিয়া উঠিতে থাকিবে, কিন্তু পরস্পর সম্মিলিত হইবে না। এখানে শ্রীভগবানের একটি অতি আশ্চর্য্য কৃপার কথা বলিতেছি। অর্থাৎ এমন উপায়ও আছে যে, বাহির হইতে বিশেষ গতি জানা যাইতে পারে। যখন যে লোমের গোড়ায় বিষ আসে, সেই লোমটী তখনই গায়ের উপর লাগিয়া যায়, এবং বিষ উক্ত লোমটী ছাড়াইয়া উপরে উঠিলেই, উহা আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আবার সমান হইয়া উঠে, এবং উহার পরের লোমটী ঐরূপ পড়িয়া যায় এবং পরক্ষণেই আবার

উঠে। এইরূপ পর পর বিষ যখন যে লোমের গোড়ায় আসিতেছে, সেই লোমটী তখনই পড়িয়া যাইতেছে ও পরক্ষণে আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই, বাহির হইতে বিষের গতি বেশ অনুভব করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ রাত্রিকালেই সর্পে দংশন করে। সুতরাং যে চিকিৎসকের হস্তে রোগী পড়ে, তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব তীক্ষ্ণ হওয়া আবশ্যক। যদি তাহার দৃষ্টিশক্তি ভাল না থাকে, তবে এক যোড়া ভাল চসমা কি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করা উচিত। ম্যাগনিফাইং গ্লাসে বড় ও বেশ পরিস্কার দেখা যায়, সুতরাং ইহা দ্বারা বিষের গতি উত্তমরূপ লক্ষিত হয়। ফলতঃ চিকিৎসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ মনোনিবেশপূর্ব্বক রোগীকে পরীক্ষা করা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। প্রথমতঃ ছিদ্রদ্বয় পরীক্ষা করিতে হইবে; তাহার পর যে যে শিরা দ্বারা বিষ উঠিবার সম্ভাবনা, তাহাই ঠিক করিতে হইবে; শেষে পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে হইবে যে, বিষ কতদূর উঠিয়াছে। বিষ যদি তখনও শিরার মধ্যে থাকে, তবে অনায়াসে উহা নষ্ট করা যায়।

বিষ কতদূর উঠিয়াছে, তাহা ঠিক জানিয়া তাহার উপর বন্ধন করিলে বিষের গতি রোধ হইবে। বিষের গতি রোধ হইলে, বিষ-বিন্দুদ্বয় আর উপরে উঠিতে না পারিয়া খানিক নিম্নে নামিয়া আসিবে, এবং তখনই আবার অধিক বেগের সহিত উপরে উঠিয়া বন্ধনে আঘাত করিবে। যদি বন্ধন দৃঢ় না হয়, তবে এইরূপে বিষ বারম্বার ঢুস মারিতে মারিতে বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিবে এবং অতি দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতে থাকিবে।

কিন্তু যদি বন্ধন খুব দৃঢ় হয়, এবং বিষ কোন ক্রমে উপরে না উঠিতে পারে, তবে উহা অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ একবার নিচে নামিয়া আসিবে, আবার দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া বন্ধনে আঘাত করিতে অর্থাৎ ঢুস মারিতে থাকিবে। শিরার মধ্যে বিষের এই গতি বাহির হইতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, তবে চক্ষের দীপ্তি ভাল থাকা আবশ্যক। কিন্তু বিষের এই ঢুস মারা প্রক্রিয়া ক্রমে কমিয়া আসিবে, এবং শেষে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহার কারণ, বিষ সেই শিরা দিয়া উঠিতে না পারিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বিষকে যদি শিরার মধ্যে পাওয়া যায়, তবে অনায়াসে সাহায্য করা যাইতে পারে। বিষ ছাড়াইয়া পড়িলে উহার সাহায্য করা কঠিন হইয়া পড়ে। উপরে দৃঢ়বন্ধন করিলে বিষ ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু তবু বন্ধন করা নিতান্ত প্রয়োজন। বন্ধন করিতে কাল বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

যদি বিষ কোন গতিকে বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগের সহিত উপরে উঠিতে থাকিবে, এবং দষ্টব্যক্তিকে শীঘ্রই প্রাণে বধ করিবে।

যে যে স্থান দিয়া বিষ উঠিতে থাকে, তাহা ক্রমে অসাড় হইয়া যাইবে, রোগীর নিকট সে অঙ্গ খুব ভারি বলিয়া বোধ হইবে, এবং উহা নাড়াচাড়া করা তাহার পক্ষে খুব কষ্টকর হইবে।

বিষ রোগীর স্নায়ু (*nerve*) অতিশয় আক্রান্ত করে, এবং ইহাই সর্পাঘাতে মৃত্যুর প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। প্রথমে স্নায়ু (nerve) ধ্বংশ হয়, এবং তাহার পর শরীর অসাড় ও অন্যান্য ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পড়ে।

বিষ শরীরে প্রবেশ করিবামাত্র, রোগীর পঞ্চেন্দ্রিয়ই আক্রান্ত হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ ও বড়বড় হয়, রোগী নাকী স্বরে কথা বলিতে থাকে, এবং তাহার আস্বাদশক্তি লোপ পাইয়া যায়। তখন জিহ্বায় তিক্ত কিম্বা মিষ্ট দ্রব্য দিলে আস্বাদনের দ্বারা রোগী উহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবে না। তাহার কর্ণেন্দ্রিয়ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হইবে। তখন রোগীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকিবে, এবং সে ঘনঘন মূর্চ্ছিত হইবে। আবার কানড় সর্পে দংশন করিলে কখন বা সমস্ত শরীর এবং কখন বা কেবল বিশেষ কোন অঙ্গ ফুলিয়া পড়িবে। এইরূপ ফুলিয়া রোগী ভয়ানক আকার ধারণ করিবে। কখন জিহ্বা এত ফুলিবে যে মুখে আর ধরিবে না, কিম্বা গাল এত ফুলিবে যে চক্ষু বুজিয়া যাইবে। কখন বা মৃত্যুর পূর্ব্বে রোগীর রক্তবর্ণের কি কৃষ্ণবর্ণের মল নির্গত হইতে থাকিবে। বোড়া সর্পে দংশন করিলে, অঙ্গ পচিয়া খসিয়া পড়িবে, এবং দংশনের ২।৪ দিন পরে রোগীর মৃত্যু হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বন্ধন ও চিকিৎসা প্রণালী।

আমরা এখন মালবৈদ্যদিগের চিকিৎসা প্রণালী বিস্তৃত-রূপে বলিব। যাঁহারা পূর্ব্বের কয়েক অধ্যায় মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

একদিন কতিপয় মালবৈদ্য একটী সর্প খেলাইতেছিল। সর্পটি সবে পূর্ব্ব দিবস ধৃত হইয়াছে, তখনও বিষদাঁত ভাঙ্গা হয় নাই, সুতরাং সম্পূর্ণ সতেজ রহিয়াছে। যে লোকটী সর্প খেলাইতেছিল, তাহার পার্শ্বে আর একজন মালবৈদ্য বসিয়াছিল। সর্পটি ফণা তুলিয়া দুলিতেছে, দুলিতে দুলিতে হঠাৎ শেষোক্ত ব্যক্তির পদতলের পার্শ্বে ছোঁ মারিল। লোকটী এরূপ ভাবে বসিয়াছিল যে, সর্প ছোঁ মারিতে মারিতে তাহাকে ঝাঁকা মারিয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না। ছোঁ মারিবার পরে যদিও সর্পটিকে সে ছুড়িয়া ফেলিল, কিন্তু তবু সর্প সেই অবকাশে দংশন করিয়া একটি দাঁত বসাইয়াছে, ও দষ্টস্থানে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে। মালবৈদ্যেরা সর্পটিকে ত তখনই ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তাহার পর, তাহা-দিগের সর্দ্দার দষ্টপদ খানি হাত দিয়া ধরিল, ক্ষণকালের জন্য একটু পরীক্ষা করিল, এবং দেখিল যে, একটি দন্ত বসিয়াছে। তখন দষ্টস্থানে মুখ দিয়া খুব জোরের সহিত চুষিল, এবং মুখে

করিয়া বিষমিশ্রিত খানিক রক্ত তুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। এইরূপে যতক্ষণ রক্ত তুলিতে পারিল, ততক্ষণ চুষিয়া ফেলিতে লাগিল, এবং যখন আর রক্ত পাইল না, তখন নিরস্ত হইল। এই রক্তের সহিত অবশ্য বিষ মিশ্রিত ছিল। তাহারপর সন্দেহ সম্পূর্ণ রূপে বিদূরিত করিবার জন্য এক খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া দষ্টস্থান উত্তমরূপে দগ্ধ করিয়া দিল। এই সামান্য উপায় দ্বারা তাহাকে তখনই আরোগ্য করিল। এবং দুই মিনিটে বিনা শ্রমে চিকিৎসা সাঙ্গ হইয়া গেল।

কিন্তু যে ব্যক্তির দাঁত পান্‌সা, কি মুখের ভিতর কোনরূপ ক্ষত থাকে, তাহার এইরূপে চুষিয়া বিষ তোলা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, যাহাদেব মাড়ী দিয়া রক্ত পড়ে, তাহারা এই ভাবে চুষিয়া রক্ত তুলিতে যাইয়া, আপন জীবননাশ করিতে পারে।

ছোট সর্পের দন্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহারা দংশন করিলে চুষিয়া বিষ উঠাইবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ ক্ষুদ্র দাঁতের ছিদ্র দিয়া চুষিয়া বিষ তোলা কঠিন। আবার যখন ছোট সর্পে তাহার খুব সরু দাঁত দিয়া দংশন করে, তখন দষ্টস্থানে অনেক সময় ছিদ্রের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। গোক্ষুরার এক দিনের ছানা দংশন করিলে, তাহাতে মৃত্যু হইতে পারে। কিন্তু দষ্টব্যক্তির শরীরে তাহার দংশনের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আবার বড় সর্পের যদি বিষদন্ত ক্ষুদ্র থাকে, তবে উহার দংশনের চিহ্নও অনেক সময় পাওয়া যায় না। নিম্নে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক দল মালবিদ্য এক দিন নানা প্রকার সর্পের খেলা

দেখাইতেছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি গোক্ষুরা ও মাঝারি আকারের একটী কেউটা ছিল। এই কেউটা সর্পটী উহাদের মধ্যে এক জন যুবা মালবৈদ্যকে দংশন করিল। সর্পটী দংশন করিয়া আর ছাড়িতে চাহে না। একটু চেষ্টা করিয়া তাহাকে ছাড়ান গেল। ইহাতে সন্দেহ হইল যে, হয়ত তাহার দু একটি বিষদাঁত ভাঙ্গিতে বাকি ছিল। এই সন্দেহ করিয়া মালবৈদ্যেরা সর্পটিকে ধরিয়া তখনই ঝুড়ির মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তাহার পরে এক গাছি রজ্জু বাহির করিয়া দষ্টস্থানের উপর বান্ধিয়া দিল। দষ্টব্যক্তির বিপদ আশঙ্কা করিয়া আমরাও সেই চিকিৎসায় যোগ দিলাম। মালবৈদ্যদিগের সর্দ্দার বলিল, "সর্পটী যে ভাবে দংশন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া সন্দেহ হইতেছে যে, উহাকে ভাল কামান হয় নাই। সম্ভবতঃ দুই একটি ছোট বিষদাঁত রহিয়া গিয়াছিল, এবং উহা বড় হইয়া দংশনোপযোগী হইয়া থাকিবে।"

দংশন করিবামাত্র সর্পকে ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া না দেওয়ার জন্য যুবাটিকে সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহার পর উহাদের সর্দ্দার দষ্টস্থান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। সে, দষ্টস্থানে স্বাভাবিক দন্তের দুই একটী সামান্য চিহ্ন ভিন্ন, বিষদাঁতের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। কিন্তু তবুও দষ্টস্থানের উপরে যে বন্ধন ছিল তাহা তখন খুলিয়া দিল না।

সর্দ্দার তখন আমাকে বলিল, "মহাশয়! সর্পকে কামাইবার সময় অসাবধানতা বশতঃ কখন কখন দুই একটি ক্ষুদ্র দাঁত থাকিয়া যায়। সুতরাং সন্দেহজনক দংশন করিয়াছে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ সর্পটিকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত যে,

উহার কোন ক্ষুদ্র দাঁত ভাঙ্গিয়া দিতে ভুল হইয়াছে কি না। যদি দষ্টস্থানে ছিদ্র থাকে, তবে বিষাক্ত দন্তদ্বারা যে দংশন করিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়।" সর্দ্দার ইহাই বলিয়া সর্পের মুখ হাতে ধরিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, উহার কোন বিষ দন্ত আছে কি না। কিন্তু কোন বিষদাঁত খুজিয়া পাইল না, তখন বন্ধন খুলিয়া দিল।

যদি দাঁত পান্‌সা না হয়, আর যদি এরূপ স্থানে দংশন করে যে, নিজে দষ্টস্থানে মুখ দিতে পারা যায়, তবে সর্পে দংশন করিবামাত্র দষ্টব্যক্তি নিজে দষ্টস্থান চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে পারে। সুতরাং যদি মাঠের মধ্যে, কি এরূপ কোন স্থানে কোন ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে যে, সেখানে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক পাওয়া যায় না, তবে তখনই উক্ত ব্যক্তি দষ্টস্থান চুষিয়া বিষ বাহির করিতে পারে।

দষ্টস্থানের উপরে বন্ধন করা সম্বন্ধে বিশেষ বিচক্ষণতার ও নিপুণতার আবশ্যক। এ বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইলে, যে ব্যক্তি ইহাতে বিশেষ বিচক্ষণ, তাহার নিকট শিক্ষা করা উচিত। যাহার ইহাতে পারদর্শীতা নাই, সে হয় বন্ধন অধিক দৃঢ় করিবে, না হয় শিথিল করিয়া ফেলিবে। বন্ধন অধিক দৃঢ় হইলে রোগীর অনর্থক কষ্ট ভোগ করিতে হয়, আবার শিথিল হইলে বিষ বন্ধন ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে। সুতরাং বন্ধন করিবার সময় তিনটি বিষয় দেখিতে হইবে। যথা,—(১) উপযুক্ত স্থানে বন্ধন করা হইয়াছে; (২) বন্ধন সমান মতন হইয়াছে, অর্থাৎ অধিক দৃঢ় কি শিথিল হয় নাই; (৩) বন্ধন গায় কসিয়া লাগিয়াছে অথচ চামড়া জড় হয় নাই।

কিসের দ্বারা বন্ধন করিলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা দুরূহ। তবে মালবৈদ্যেরা সাধারণতঃ সোণের দড়িই ব্যবহার করে, এবং তাহা না পাওয়া গেলে, পাটের দড়ির দ্বারাও বন্ধন করিয়া থাকে। দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে হইলে, বন্ধনের নিম্নে একগাছি লাঠি দিয়া, তাহার উপর কসিয়া বন্ধন করিতে হইবে। তৎপরে লাঠি বাহির করিয়া লইলে, বন্ধন দৃঢ় হইবে, অথচ চামড়া জড়াইয়া যাইবে না। বন্ধন-কার্য্যে পটু হইবার ইচ্ছা থাকিলে, প্রথমতঃ নিজের কি অপর কাহার গাত্রে বন্ধন করিয়া ইহা শিক্ষা করা উচিত। সরু দড়ি দিয়া বাঁধিলে বন্ধনস্থান কাটিয়া যাইয়া রোগীর ক্লেশ হইতে পারে, আবার দড়ি অধিক মোটা হইলে বিষের গতি রোধ হইবে না। সুতরাং মাঝারি রকম দড়ির দ্বারা বন্ধন করাই উচিত। একটি পেন্সিলের ন্যায় মোটা দড়ি হইলেই ঠিক হইতে পারে।

দংশন করিবামাত্রই যদি বাঁধা যায়, তবে দষ্টস্থানের এক কিম্বা দুই ইঞ্চি উপরে বন্ধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যখন দংশন করিবার পর অনেকক্ষণ গত হইয়াছে, এবং বিষ কতদূর উঠিয়াছে তাহা ঠিক করা যাইতেছে না, তখন দষ্ট-অঙ্গের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বন্ধন করা উচিত। মনে কর, এক জনের পায়ে দংশন করিয়াছে, এবং দংশনের পর অনেক সময় গত হইয়াছে ও কতদূর বিষ উঠিয়াছে তাহা ঠিক করা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় উরুদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থানে, অর্থাৎ যত উচ্চে বন্ধন করা সম্ভবপর হয়, সেই স্থানে প্রথমে বন্ধন করিতে হইবে।

বন্ধন একটির অধিক দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, বন্ধন যায়

না হইলে, উহাতে বিষের গতি রোধ হয় না। সেই জন্য মালবৈদ্যেরা সাধারণতঃ তিনটি করিয়া বন্ধন দিয়া থাকে। এই বন্ধন গুলির মধ্যে কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান রাখিতে হইবে। আর প্রথম বন্ধন অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অধিক দৃঢ়, এবং তৃতীয়টী তদপেক্ষাও অধিক দৃঢ় করা উচিত।

উপরে বলিয়াছি, কাহারও একটী বন্ধন দিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। কারণ বন্ধন ভাল না হইলে বিষ সহজেই ইহা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। উপর্য্যুপরি তিনটি বন্ধন দিবার উপকারিতা পরে বিস্তারিত বলা যাইবে। তবে এখানে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বন্ধন দ্বারা বিষের গতি সম্পূর্ণ রোধ না হইলেও, তিনটি বন্ধন করিলে ভালরূপে চিকিৎসা করিবার অনেক সময় পাওয়া যায় এবং বিষের তীব্রতাও নষ্ট করা যাইতে পারে।

বন্ধন করিয়াই উহাতে জল ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা বন্ধনরজ্জু দৃঢ় ও সমানভাবে গাত্রে বসিয়া যাইবে যদি বন্ধন সময় মতন ও ঠিকরূপে করা যায়, তাহা হইলে দষ্টব্যক্তির জীবনের কোন আশঙ্কা থাকে না। তবে কখন কখন এরূপ স্থানে দংশন করে যে, আদপে বন্ধন করার সুবিধা হয় না। যেমন,—পৃষ্ঠে, মস্তকে, কি বুকে দংশন। এরূপ দংশনে কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইবে পরে বলিব।

অষ্টম অধ্যায়।

চিকিৎসা প্রণালী।

মালবৈদ্যেরা তাহাদিগের চিকিৎসা প্রণালী চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে। যথা—থুবি, সাতি, বেড়ি, ও পিং চুষিয়া বিষ তুলিয়া লওয়াকে ইহারা কোন বিশেষ চিকিৎসার মধ্যে ধরে না। কিন্তু চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও উত্তম চিকিৎসা। এইরূপ চিকিৎসার আর একটী বিশেষ সুবিধা আছে। শরীরের প্রায় সকল স্থানেই চুষিতে পারা যায়। সুতরাং যে কোন স্থানেই সর্পে দংশন করুক না কেন, দংশন করিবামাত্র যদি চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলা যায়, তবে বিষ তৎক্ষণাৎ সাহায্য করা যাইতে পারে। তবে সকল সময় চুষিয়া বিষ সাহায্য করা সুবিধা হয় না।

চুষিয়া বিষ তুলিবার উপকারিতা দেখাইতেছি। মনে ভাব পৃষ্ঠদেশে দংশন করিল। অমনি যাহার মুখে ঘা নাই কি যাহার দাঁত পান্‌সা নহে, সে চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলিতে পারে। যদি দষ্ট ছিদ্রের মুখ সরু হয়, কি চুষিয়া, রক্ত ভাল করিয়া না বাহির হয়, তাহা হইলে ছুরিকা দ্বারা ছিদ্রের মুখ পরিসর করিয়া লইতে হইবে। কি একটা টাকা যত বড়, ততখানি মাংস সমেত দষ্টস্থান ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। দংশন মাত্রেই অর্থাৎ বিষ দষ্টস্থানে

থাকিতে থাকিতে যদি এইরূপ কাটিয়া ফেলা যায়, তবে ঐ মাংস খণ্ডের সঙ্গে বিষ বাহির হইয়া যাইবে, এবং যদিও অল্প মাত্র থাকে, তাহা ,অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হওয়ায়, তাহার সহিত বাহির হইয়া পড়িবে।

যেখানে চুষিয়া বিষ সাহায্য করা সুবিধা না হয়, অথচ বন্ধন করা যাইতে পারে, সেখানে দংশন মাত্রই দষ্টস্থানের উপর বন্ধন করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিষ শিরায় প্রবেশ করিতে কিছু সময় লাগে, এবং যতক্ষণ ছিদ্রের মধ্যে বিষ থাকে ততক্ষণ দষ্টস্থান ফুলিতে থাকিবে। সুতরাং দষ্টস্থান ফুলা দেখিলে বুঝা যাইবে যে বিষ ক্ষতস্থানেই রহিয়াছে। ক্ষতস্থানে বিষ থাকিতে থাকিতে একখণ্ড জলন্ত অঙ্গার কি উত্তপ্ত লৌহখণ্ড সেখানে ধরিবে। উহা ঠাসিয়া ধরিবামাত্র পট্ করিয়া অল্প শব্দ হইবে। এইরূপ শব্দ হইলেই জানিতে পারিবে যে, বিষ সাহায্য হইয়া গিয়াছে। এইরূপে অগ্নি ঠাসিয়া ধরাকেই "খুবি" বলে।

উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দ্বারাই "খুবি" ভাল হয়। ইহার একমাত্র দোষ যে, লৌহ খুব গরম করিতে অধিক সময় লাগে। তেমনি অন্য জিনিশ অপেক্ষা ইহার উত্তাপও অনেকক্ষণ স্থায়ী। মালবৈদ্যেরা এইরূপে পোড়াইবার জন্য লৌহখণ্ড সর্ব্বদাই তাহাদের কাছে রাখে। ইহার মুখ গোলাকার এবং ধরিবার জন্য কাষ্ঠের হাণ্ডল আছে। ইহা দেখিতে অনেকটা শিলমোহরের ন্যায়। প্রথমে এই গোলাকার মুখ জলন্ত অগ্নির মধ্যে দিতে হয়, এবং ইহা উত্তপ্ত হইয়া খুব লাল হইলে দষ্টস্থানে ঠাসিয়া ধরে। যতক্ষণ লৌহ উত্তপ্ত হইতে সময় লাগে ততক্ষণ বিষ ঘা মুখে থাকে। দংশনে দুইটী ছিদ্র হইলে, দুইখানি,

এবং একটী ছিদ্র হইলে একখানি, লৌহের আবশ্যক হয়। তবে যদি লৌহার গোলাকার মুখে একেবারে দুইটী ছিদ্র, আচ্ছাদিত হয়, তবে একখণ্ড লোহা দ্বারাই হইতে পারে। জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারাও থুবি হইতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তাপ বেশীক্ষণ থাকে না। তবু লোহা না পাওয়া গেলেও এই জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারাই কার্য্য উদ্ধার হয়।

সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা উচিত যে, যে প্রকার চিকিৎসাই অবলম্বন করা হউক না কেন, দংশন মাত্রেই বন্ধনকরিতে হইবে। এবং চুষিয়া যদি বিষ সাহায্য করিবার সুবিধা না থাকে, তবে বন্ধন করিয়াই চিকিৎসা আরম্ভ করিতে হইবে।

আবার ইহাও হয়। থুবি করিতে অর্থাৎ লৌহ উত্তপ্ত করিতে যে সময় লাগে, তাহার মধ্যে দষ্টস্থানে ছুরি দ্বারা চিরিয়া দাও। এক স্থানে না চিরিয়া, দষ্টস্থানের চারিপার্শ্বে ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাত কর। ইহাতে রক্ত পড়িতে থাকিবে, ও সেই রক্তের সহিত বিষ বাহির হইয়া পড়িবে। তখন তাহার উপর থুবি দিতে হইবে। অবশিষ্ট যে বিষ থাকিবে, তাহা ইহাতে সাহায্য হইয়া যাইবে।

বিষ যতক্ষণ ক্ষতস্থানে থাকে, অর্থাৎ ক্ষতস্থানে যতক্ষণ ফুলা থাকে, ততক্ষণ থুবি চিকিৎসা চলিবে। কিন্তু বিষ ছিদ্র ছাড়াইয়া উপরে উঠিলে থুবির দ্বারা আর কোন ফল হইবে না। তখন রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে, অর্থাৎ যখন দেখিবে যে বিষ ছিদ্র ছাড়াইয়া অবে উঠিয়াছে, তখন দুষ্টস্থানের উপরি ভাগে একখানি ল্যান্সেট বা তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। কিন্তু

এরূপ করিয়া চিরিতে হইবে যে, ক্ষত বেশী গভীর না হয়, অথচ রক্ত বাহির হয়। উল্কি কি টিকা দিবার সময় যেরূপ করিয়া চিরিতে হয়, সেইরূপে ছুরির অগ্রভাগ দিয়া ঘন ঘন করিয়া চিরিয়া দিবে। এইরূপে সর্পদষ্ট স্থানের উপর ২০।২৫ স্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকিবে। তখন ইহার উপর লবণ কি বারুদ দিয়া বেশ করিয়া ঘসিবে। ইহাতে রক্ত আরও বেশী পরিমাণে বাহির হইতে থাকিবে। এইরূপ রক্ত-মোক্ষণ করাকে "সাতি" বলে।

এইরূপ রক্তমোক্ষণের দ্বারা শরীর নির্ব্বিষ হইবে, না হয়, অধিক পরিমাণে বিষ বাহির হইয়া যাইবে। বিষমিশ্রিত রক্তের বর্ণ কাল। সুতরাং বিষ কতদূর উঠিয়াছে, রক্তমোক্ষ-ণের দ্বারা তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। বিষ দষ্টস্থান ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ঠিক কতদূর উঠিয়াছে তাহা জানা যাইতেছে না। তখন একখানি তাক্ষ্ণ ছুরী লইয়া বন্ধন স্থানের নিচে চিরিতে থাক। যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণের রক্ত পাইবে, সেই পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে বুঝিতে পারিবে। যেখানে দেখিবে তাজা রক্ত বাহির হইতেছে, তখন জানিতে পারিবে যে, বিষ ততদুর উঠে নাই।

শিরা বাহিয়া বিষ উঠিবার সময়, বিষ যতদুর উঠে ততদুর কিয়ৎক্ষণ আদপে রক্ত পাওয়া যাইবে না। একটু পরে ঐ স্থানে আবার রক্তের সঞ্চার হইতে থাকিবে। এই রক্ত দেখিতে অন্যরূপ, তাজা রক্তের ন্যায় নহে। আবার ইহার পরিমাণও কম। রক্তমোক্ষণের সময় এই দূষিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিষ বাহির হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ ক্ষতস্থান

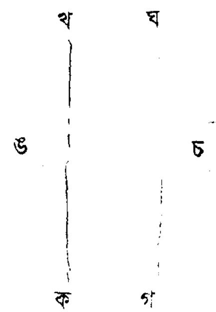
সকল হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকিলে, বিষ আর পূর্ব্বের ন্যায় ত্বরিত গতিতে উপরে উঠিতে পারিবে না। অর্থাৎ ছুরি দ্বারা ক্ষত করিয়া দিলে রক্তের গতি নিচে ক্ষতমুখের দিকে আসে, সুতরাং উহা বাহিয়া বিষ উঠিতে পারে না।

যাহারা সর্পচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী, তাহারা উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে বড় একটা চিকিৎসা করে না। তাহারা প্রথমে মুখ দিয়া চুষিয়া বিষ তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে দষ্টস্থান অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দিবে। কিন্তু বিষ যদি ছিদ্রের মুখ ছাড়াইয়া উঠিয়া থাকে, তবে উহা কোন্ কোন্ শিরায় প্রবেশ করিয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিবে। এই পরীক্ষা পূর্ব্বলিখিত প্রণালী অনুসারে করিতে হইবে। আবার অনেক সময় রোগীও বলিতে পারিবে যে, বিষ কতদূর উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অব্যর্থ পরীক্ষা হইতেছে লোমের গতি নিরীক্ষণ করা, অর্থাৎ বিষ যখন যে লোমের গোড়ায় উঠিতেছে, অমনি সেটী গায়ের উপর পড়িয়া যাইতেছে, এবং যেই সে লোমটী ছাড়াইয়া বিষ উঠিতেছে, অমনি উহা সমান হইয়া উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তাহার পর, বিষ যে দুটি শিরায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং যতদূর উঠিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া লইয়া, পারদর্শী ব্যক্তি ঠিক যে স্থানে বিষ উঠিয়াছে, তাহার অর্দ্ধ ইঞ্চি উপরে ঐ শিরাদ্বয় চিরিয়া দিবে। এদিকে বিষ ক্রমে উঠিতেছে, এবং যে সেই ক্ষতস্থানের মুখের কাছে আসিয়াছে, অমনি ঐ ব্যক্তি বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া ধরিয়াছে ও বিষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে অতি সহজ উপায়ে দষ্টব্যক্তির শরীর হইতে

বিষ বাহির করিয়া ফেলা যাইবে, এবং ইহাতে রোগীর কোন-রূপ কষ্ট হইবে না।

মনে ভাব, ক-খ ও গ-ঘ দুই শিরা দিয়া বিষ উঠিতেছে। চিকিৎসক ইহা দেখিয়া ঙ ও চ এই দুই স্থানে কাটিয়া দিল। তাহার পরে বিষ এই কাটার স্থানে আসিলে, টিপিয়া ঙ ও চ এই দুই স্থান দিয়া বিষ বাহির করিয়া তুলিয়া দিল। কোন্ শিরাদ্বয় দিয়া বিষ উঠিতেছে তাহা যাহারা নিরাকরণ করিতে না পারে, তাহারা বন্ধনস্থানের নিচে উহা নিরাকরণ করিতে পারিবে। কিরূপে পারিবে বলিতেছি।



পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিষ বন্ধন পর্য্যন্ত যাইয়া উহা ভেদ করিয়া যাইবার চেষ্টা করে, এবং সেইজন্য বিষ বন্ধনের নিকট উঠিয়া নামিয়া আসে, আবার অধিক বেগের সহিত বন্ধনের দিকে উঠে। অতিশয় মাথা ধরিলে যেমন কপালের দুই পার্শ্বের শিরা দপ দপ করিতেছে বেশ দেখা যায়, সেইরূপ যখন বিষ বন্ধন ছাড়াইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে থাকে, তখন বন্ধনের নিচে ঐ শিরাদ্বয় ঐরূপ দপ দপ করে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই শিরাদ্বয়ের মধ্যে বিষের গতি নিরীক্ষণ করিয়া, এবং যে দেখিল, বন্ধনে ঢুস মারিয়া বিষ নিম্নে আসিতেছে, অমনি তীক্ষ্ণ ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া ঠিক বন্ধনের নিম্নে ঐ শিরা-দ্বয় চিরিয়া দেয়। তাহার পর, বিষ বেগের সহিত উপরে উঠিবার সময় আপনাপনি ক্ষতস্থান দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

কখন কখন বিষের গতি আদপে অনুভব করা যায় না। এরূপ স্থলে মালবৈদ্যেরা ইহা জানিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা গরম জল দিয়া বন্ধনের নিম্নে হস্তদ্বারা উত্তমরূপ রগড়াইয়া ফেলে। এরূপ করিয়া দিলেই, যে স্থানে বিষ থাকে, সেইস্থানে গোলাকার হইয়া ফুলিয়া উঠে। চিকিৎসক, বিষ কোথায় আছে তাহা জানিতে পারিলেই, অমনি ছুরি দ্বারা চিরিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বিষ বন্ধনের নিকট আসিয়া বারম্বার আঘাত করে, আর বারম্বার নিচে নামিয়া আসে। শেষে বন্ধন ছাড়াইতে না পারিয়া, উহার নিচে, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন বন্ধনের নিচে, যেখানে ছুরি দ্বারা চিরিয়া দাও, সেইখানেই বিষের চিহ্ন দেখিতে পাইবে। সুদক্ষ চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা রোগীকে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ না দিয়া বিষ বাহির করে। শরীর হইতে বিষ বাহির করা, কি রোগীকে আরোগ্য করা, তাহাদের নিকট অতি সামান্য কথা কিন্তু রোগীকে অনর্থক কষ্ট না দিয়া আরাম করাই তাহারা গৌরবের কার্য্য মনে করে। এই জন্য তাহারা নিম্নলিখিত কয়েক রকম চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা,—(১) চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলা ; (২) থুবি বা অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দেওয়া ; (৩) শিরার মধ্যে বিষের গতি নিরীক্ষণ করিয়া, ছুরি দ্বারা চিরিয়া বিষ বাহির করা ; (৪) বন্ধনের ঠিক যে স্থানে বিষ আঘাত করে, সেই স্থান চিরিয়া বিষ বাহির করা।

চুষিয়া বা ছুরি দ্বারা চিরিয়া বিষ বাহির করিবার পর, যদি শরীরে বিন্দুমাত্র বিষ থাকে, এই আশঙ্কায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক

ক্ষতস্থান সকল ভাল করিয়া পোড়াইয়া দেয়। উপরে বলিয়াছি যে, বিষ যতদূর উঠে, ততদূর অসাড় হইয়া যায়। সুতরাং ঐ স্থান চিরিয়া দিলে, কি অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে, রোগীর বিশেষ কোন কষ্ট হয় না।

কিন্তু অনেক সময়েই সুদক্ষ চিকিৎসক আপন গুণপণা দেখাইবার সুবিধা পায় না। কারণ, প্রায়ই এরূপ ঘটনা হয় যে, চিকিৎসক যখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন বিষ এরূপ স্থানে উঠিয়াছে যে, আর সহজভাবে চিকিৎসা করার উপায় নাই।

সাধারণতঃ এইরূপ ঘটে। চিকিৎসক আসিয়া দেখে যে রোগীকে সর্পে দংশন করিয়াছে, আর দষ্টস্থানের উপরে বন্ধন করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় চিকিৎসকের প্রথম দেখা উচিত যে, বন্ধনের দ্বারা বিষের গতিরোধ হইয়াছে কি না। কিন্তু চিকিৎসক তখন পরীক্ষা করিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে সাহস করে না। সে আসিয়াই, রোগীকে পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে, প্রথম বন্ধনের উপর আর দুইটী বন্ধন করিবে। এই বন্ধনের দ্বারা বিষের গতিরোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া, তাহার পর ভাল করিয়া রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

দংশনের পর চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিতে কিছু সময় গত হয়, সুতরাং শিরা বাহিয়া বিষ ক্রমে উঠিতেছে, ইহা দেখা চিকিৎসকের ভাগ্যে বড় ঘটে না। যদি কখন চিকিৎসক শিরার মধ্যে বিষ পায়, তবে ছুরি দ্বারা চিরিয়া তখনই উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয়। তবে, প্রায়ই চিকিৎসক আসিয়া দেখে যে, বিষ প্রথম বন্ধন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং বন্ধন ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। চিকিৎসক ছুরি দ্বারা

চিরিয়া ঐ স্থান পরীক্ষা করিয়া দেখে। এরূপ স্থানে যদি বিষ থাকে, তবে হয় রক্ত আদপে পাওয়া যাইবে না, কি যদি পাওয়া যায় তবে তাহার বর্ণ ফিকে কাল। এইরূপে বিষের স্থান ঠিক করিয়া সে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবে।

চিকিৎসক তখন বন্ধনের নিচে ছুরি দ্বারা অল্প গভীর করিয়া নানা স্থান চিরিয়া দেয়। ইহার প্রত্যেক ক্ষতস্থান হইতে কালবর্ণের রক্ত নির্গত হইতে থাকে, এবং এই রক্তের সহিত বিষ বাহির হইয়া যায়। তখন উহার উপর ভাল করিয়া লবণ মাখাইয়া দেয়। ইহাতে রক্ত অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে ও সেই সঙ্গে বিষও নির্গত হয়। রক্ত বাহির হওয়া বন্ধ হইলে, কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত গরম জল দিয়া ঐ স্থান ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে লবণ মিশ্রিত রক্ত ধুইয়া যাইবে। তবে, বিষ যখন দ্রুতগতিতে উঠিতে থাকে, কিম্বা যখন খুব তেজঃশালী গোক্ষুরা কি অন্য কোন ফণাধারী সর্পে দংশন করে, তখন গরম জল দিয়া ধুইবার পূর্ব্বে "থুবি" প্রয়োগ করা উচিত।

ক্ষীণ-বিষ হইলে অগ্নির উত্তাপে উহার তেজ নষ্ট করা যাইতে পারে। কানড় কিম্বা অপর কোন ফণাহীন সর্পে দংশন করিলে, একমাত্র থুবি অর্থাৎ অগ্নির প্রয়োগে রোগীকে আরাম করা যাইতে পারে। এই অগ্নির উত্তাপ অনেক প্রকারে দেওয়া যায়। যথা—(১) বালি কি লবণের পোট্‌লার উত্তাপ; (২) ক্ষতস্থানে কলা কি অন্য কোন কাঁচা পাতা বিছাইয়া তাহার উপর পলিতা কি মশাল দ্বারা উত্তাপ; (৩) ক্ষতস্থানে গরম জলের ধারাণী।

যাহা হউক, লবণ মিশ্রিত রক্ত গরম জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিয়া আবার ছুরি দ্বারা চিরিতে হইবে। এইবার যে রক্ত বাহির হইবে, তাহার বর্ণ আর সেরূপ কাল থাকিবে না। এই রক্ত পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাল দেখা যাইবে। তাহার পর আবার লবণ মাখিয়া ধুইতে হইবে। এইরূপে ৩।৪ বার করিবার পর স্বাভাবিক বর্ণের রক্ত বাহির হইতে থাকিবে। তখন জানা যাইবে যে, বিষ সম্পূর্ণ কি অধিকাংশ বাহির হইয়া গিয়াছে।

তখন রোগীকে বিশ্রাম করিতে দিবে এবং ক্ষতস্থানে আগুণের সেঁক দিবে। কয়েক মিনিট এইরূপ করিবার পর, আবার ছুরির দ্বারা চিরিয়া রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যদি বিষ সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়া থাকে, তবে রক্তের বর্ণ আর পরিবর্ত্তন হইবে না। তাহার পর রোগীকে আবার বিশ্রাম করিতে দিবে এবং আবার সেঁক দিবে। কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিতে দিয়া আবার এইরূপে রক্ত পরীক্ষা করিবে। এইরূপে আধ ঘণ্টা কাল যদি রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে শরীরে বিষ আদপে নাই।

কিন্তু অনেক সময় প্রথমবার বিশ্রাম করিতে দিবার পর যখন পরীক্ষা করা হয়, তখন দেখা যায় যে রক্তের বর্ণ আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাল হইয়াছে। যখন শরীরে বিষ থাকিয়া যায়, তখনই রক্ত পুনরায় বিবর্ণ হয়। এরূপ হইলে আবার ঐ ভাবে চিকিৎসা করিতে হইবে; অর্থাৎ পুনরায় ছুরির অগ্রভাগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ ও ক্ষতস্থানে লবণ মাখিয়া গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। এইরূপ বারম্বার করিতে থাকিলে ক্রমেই রক্তের সহিত বিষ

বাহির হইবে, আর ক্রমেই রক্তের বর্ণ লাল হইবে। কিন্তু প্রত্যেকবার ধুইয়া ফেলিবার পর যেন রোগীকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে দেওয়া হয়। এইরূপ করিতে করিতে যখন দেখিবে যে রক্ত আর বিবর্ণ হইতেছে না, তখন জানিবে যে শরীরে বিষ নাই। তখন বন্ধনটী খুলিয়া দিতে পার।

এরূপও অনেক সময় ঘটে যে, তুমি বন্ধনের নিচে ছুরির দ্বারা চিরিয়া রক্ত বাহির করিতেছ, ওদিকে একবিন্দু বিষ কোন গতিকে বন্ধন ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। অর্থাৎ বন্ধনের নিচে যেরূপ চিরিয়া রক্ত পরীক্ষা করিবে উপরেও সেইরূপ করিতে হইবে।

বিষ প্রথম বন্ধন উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলেই উপরে উঠিতে থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বন্ধনের কাছে পৌছিয়া আবার ইহার গতি রোধ হইবে। তখন দ্বিতীয় বন্ধনের নিচে ছুরি দিয়া চিরিলে ইহা হইতে যে রক্ত বাহির হইবে, তাহার বর্ণও প্রথম বন্ধনের নিচের রক্তের ন্যায় কাল। কখন কখন প্রথম বন্ধনের নিচে ও উপরে একই সময়ে বিষ পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায়ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে উপরে ও নিচে চিকিৎসা করিতে হইবে।

এই প্রকারে বিষ দ্বিতীয় বন্ধন ছাড়াইয়াও উঠিতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন ভালরূপে বান্ধা না হওয়ায় এইরূপে বিষ উঠিবার সম্ভব। যদি এরূপ হয় এবং যদি তৃতীয় বন্ধনটি দৃঢ় থাকে, তাহা হইলেও আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন ছাড়াইয়া বিষ উপরে উঠিলে, তৃতীয় বন্ধনের উপর যদি স্থান থাকে, তবে আরও দুই একটী বন্ধন দিতে হইবে। তৃতীয় বন্ধন দিবার সময় তাহার উপরে বন্ধন

করিবার স্থান রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বে দষ্টস্থানের উপর এক কি দুইটী বন্ধন সচরাচর দেওয়া হয়। কিন্তু এই বন্ধন অনেক স্থলে অনভিজ্ঞ লোকেই দিয়া থাকে। এদিকে চিকিৎসককে ডাকাইয়া আনিতে অনেক সময় নষ্ট হয়। চিকিৎসক আসিয়াই, বিষ কতদূর উঠিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আর সময় নষ্ট না করিয়া তাড়াতাড়ি দষ্ট অঙ্গের সর্ব্বোচ্চস্থানে ভাল করিয়া বন্ধন করে। সুতরাং চতুর্থ কি পঞ্চম বন্ধন করিবার স্থান আর থাকে না।

এটী স্মরণ রাখা উচিত যে, মালবৈদ্যদিগের চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য বিষের উগ্রতা কমান। অগ্নির উত্তাপে ইহার তেজ খুব কমিয়া যায়। আবার রক্তমোক্ষণের দ্বারা বিষ বাহির করিয়া ফেলিলে ইহার পরিমাণ কম পড়ে এবং সেই সঙ্গে ইহার তেজও হ্রাস হয়। সুতরাং শরীর হইতে খানিক বিষ বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে, ইহার তেজ খর্ব্ব হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতিও মন্দীভূত হইয়া পড়ে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধন ছাড়াইয়া বিষ উঠিলে কিছু ভয়ের কথা বটে। যে সকল সর্পের বিষদাঁত খুব লম্বা তাহাদের বিষ-কোষও বড়, এবং বিষও খুব উগ্র। সুতরাং শুধু যে বান্ধিবার দোষেই বিষ বন্ধন ছাড়াইয়া উপরে উঠে তাহা নহে, লম্বাদাঁতযুক্ত সর্প দংশন করিলেও, ঐ বিষ অতিশয় উগ্র বিধায় বন্ধন ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। বৃহদাকারের কেউটা, পচা বোড়া এবং পাতরাজ জাতীয় সর্প যখন দংশন করে, তখন বন্ধনদ্বারা বিষের গতি রোধ করা কঠিন হইয়া পড়ে। রক্ত-

মোক্ষণ ও অগ্নির উত্তাপ দ্বারা বিষের তেজ অনেক সময় কমিয়া যায় সত্য, কিন্তু লম্বাদাঁতযুক্ত সাপে দংশন করিলে উহাতে বিষের গতি রোধ হয় না। সুতরাং যখন ভাল-রূপ বন্ধন দ্বারাও বিষের গতি রোধ হইতেছে না দেখিবে, তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে বৃহৎ ফণাযুক্ত সর্প, কি পচা বোড়া অর্থাৎ যাহাদের বিষদাঁত খুব লম্বা, তাহারাই দংশন করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় "বেড়ি" প্রয়োগ করিতে হইবে।

মালবৈদ্যেরা প্রায় বেড়ি প্রয়োগ করে না, কারণ ইহার প্রয়োগের আবশ্যকতা প্রায় উপস্থিত হয় না। কিন্তু যখন বন্ধনের দ্বারা বিষের গতি রোধ হইতেছে না দেখিবে, তখন "বেড়ি" প্রয়োগই দষ্টব্যক্তির জীবন রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়। কারণ, বিষ যদি একবার সব বন্ধন গুলি ছাড়াইতে পারে, তবে উহা দ্রুতগতিতে উঠিতে থাকিবে, এবং তখন রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হইয়া পড়িবে।

উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা খুব গভীর ও গোল করিয়া পোড়াইয়া দেওয়াকেই "বেড়ি" বলে। বিষ যতদূর উঠিয়াছে, তাহার উপরেই যে বন্ধন থাকিবে, সেই বন্ধনের দড়ির উপরে বেড়ি দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত প্রকারে বেড়ি দিতে হয়। প্রথম, দুইখানি কাস্তে, কি ঐ ধরণের অপর দুইখানি অস্ত্র, ঘুটার আগুনে ভাল করিয়া উত্তপ্ত কর। অস্ত্র দুইখানি খুব লাল হইলে উহার দ্বারা বন্ধনের ঠিক উপরে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া সিকি ইঞ্চি গভীর করিয়া দাগ দিয়া দাও। বেড়ি দিতে বিশেষ দক্ষতার আবশ্যক। প্রথম একখানি অস্ত্র লইয়া বন্ধনের অর্দ্ধেকাংশের উপর ঠাসিয়া ধরিলে. ইহাতে গভীর হইয়া পুড়িয়া

দাগ লাগিয়া যাইবে। আবার অন্য অস্ত্র খানি লইয়া বন্ধনের অপরার্দ্ধ ঐরূপে পোড়াইতে হইবে। এই উত্তপ্ত অস্ত্রের স্পর্শে প্রথমে বন্ধনের দড়ি পুড়িয়া যাইবে, তাহার পর ইহা চর্ম্ম ও মাংস ভেদ করিবে, এবং যেখানে মাংস বেশী পুরু নহে, সেখানে হাড়ে যাইয়া পৌছিবে। এইরূপে বেড়ি প্রয়োগ করিতে পারিলেই রোগীর জীবনে আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

ইহার কারণ এই। যখন সমস্ত বিষ আসিয়া বন্ধনের নিচে জড় হয়, তখন ঐ বন্ধনের উপর বেড়ি প্রয়োগ করিলে, তাহার উত্তাপে বিষ নষ্ট হইয়া যায়। আর অবশিষ্ট যদি কিছু থাকে, গভীর করিয়া পোড়াইয়া পথ বন্দ করিয়া দেওয়ায়, তাহা আর উপরে উঠিতে পথ পায় না।

বেড়ি এরূপ ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে যে, কেবল উপরের শিরা গুলি (superficial veins) নষ্ট হয়, কিন্তু আবশ্যকীয় স্নায়ু সকল (nerves) কোনরূপে দগ্ধ না হয়। যদি স্নায়ু নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে দষ্ট–অঙ্গ দুর্ব্বল ও অনেক সময় অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। বেড়ি দিলে দগ্ধস্থানে ঘা হইবে। তখন ইহাতে নারিকেলের তৈল লাগাইবে। কয়েক দিন মধ্যে ঘা শুখাইয়া যাইয়া কেবল দগ্ধস্থানে একটী গভীর দাগ থাকিয়া যাইবে।

আমরা স্বহস্তে কখন বেড়ি প্রয়োগ করি নাই, কিম্বা প্রয়োগ করিতে দেখিও নাই। কিন্তু বেড়ি প্রয়োগ দ্বারা আরাম হইয়াছে, এরূপ একটী লোককে আমরা দেখিয়াছি। এ একটী যুবা মালবৈদ্য। পাতরাজ জাতীয় সর্প ধরিতে সুন্দর বনে গিয়াছিল। তাহার সঙ্গে অবশ্য আরও মালবৈদ্য ছিল।

তাহাদের নৌকা সুন্দরবনে পৌছিলে, ঐ যুবাটী একক বনের ভিতর বেড়াইতে যায়, এবং সেখানে একটী পাতরাজ জাতীয় সর্প তাহাকে দংশন করে। সে অমনি দৌড়িয়া নৌকায় আসিল। তখন প্রবীণ কয়েকজন মালবৈদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে বিষ দ্রুতগতিতে উঠিতেছে। তাহারা প্রথমে দষ্টস্থানের উপর উত্তমরূপে বন্ধন করিল, কিন্তু ইহাতে বিষের গতি রোধ না হওয়ায় বেড়ি প্রয়োগ করিল। আমরা যখন ঐ যুবকটীকে দেখিলাম, তখন তাহার বাম হস্তের কণুইয়ের উপরে, একটী গভীর দাগ রহিয়াছে মাত্র। এই বেড়ি প্রয়োগের দ্বারা তাহার বাহুর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই।

সর্পচিকিৎসকদিগের বেড়ি প্রয়োগ করিবার সুযোগ অতি অল্পই ঘটে, সুতরাং ইহাতে সুদক্ষ হইয়াছে এরূপ লোক কেবল প্রাচীন মালবৈদ্যদিগের মধ্যেই কখন কখন দেখা যায়। অপটু লোকে বেড়ি দিতে গেলে, হয় অঙ্গ অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিবে, আর না হয় এত কম গভীর করিয়া পোড়াইবে যে, উহাতে বিষ নষ্ট কি বিষের গতি রোধ হইবে না, সুতরাং রোগীকেও নিরাপদ করিতে পারিবে না। কিন্তু বেড়ি অব্যর্থ চিকিৎসা।

নবম অধ্যায়।

বন্ধন ব্যতীত চিকিৎসা।

অনেক সময় সর্প এরূপ স্থানে দংশন করে যে, সেখানে আদপে বন্ধন করা যায় না। তবে এরূপ স্থানে সর্পে দংশন করিয়াছে ইহা প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এরূপ স্থানে দংশন করিলে বড় বিপদের কথা। যখন কেহ শয়ন করিয়া কি নিদ্রিত অবস্থায় থাকে, তখনই এরূপ দংশন করিবার সম্ভব। এই অবস্থায় যদি কানড় সর্পে দংশন করে, তবে অনেক সময় আদপে নিদ্রাভঙ্গ হয় না। কারণ, কানড়ের দংশনে যন্ত্রণা খুব কম। ছোট ছোট ছেলেকে এরূপ অবস্থায় মরিয়া যাইতে আমরা দেখিয়াছি। এরূপ কোন স্থানে (অর্থাৎ যেখানে বন্ধন করার সুবিধা না হয়) সর্পে দংশন করিলে উহা যদি "টিপ" কামড় বলিয়া বোধহয়, তবে তখনই চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলিবার পর, দষ্টস্থান, হয় উত্তপ্ত লৌহ কি জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া, পোড়াইয়া দিবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিষের আস্বাদ অতিশয় তিক্ত। সুতরাং চুষিবার সময় রক্তের সহিত বিষ উঠিতেছে কি না তাহা আস্বাদ দ্বারা বেশ বুঝা যায়। আর শরীরে একবিন্দু বিষ থাকিলে, তাহাও এই আস্বাদনের দ্বারাই ঠিক করা যাইতে পারে। রক্তের আস্বাদ লবণাক্ত, ইহাতে তিক্ত আস্বাদ আদপে

নাই। সুতরাং বিষমিশ্রিত রক্তের ও সুধু রক্তের বিভিন্নতা আস্বাদ দ্বারা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

যদি চুষিয়া বিষ উঠান সুবিধা ও সম্ভবপর না হয়, তবে ছুরি দ্বারা চিরিয়া ছিদ্রদ্বয় গভীর ও প্রশস্ত কর। দষ্টস্থানের চারিদিকে ছুরিকার অগ্রভাগ দ্বারা এরূপ আঘাত কর যে, গল গল করিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। তখন উহা চুষিয়া লইতে হইবে; একবার নয়, বারম্বার, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত রক্তে তিক্ত আস্বাদ থাকে। তাহার পরে ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পোড়াইয়া দাও। দষ্টস্থান স্ফীত থাকিতে থাকিতে, অর্থাৎ বিষ উপরে উঠিবার পূর্ব্বে, যদি ঐ স্থান কাটিয়া ও পোড়াইয়া দেওয়া যায়, তবে রোগী প্রায়ই আরোগ্যলাভ করে। সিঙ্গা লাগাইয়াও বিষ উঠান যায়। প্রথমে দষ্টস্থানের চারিপার্শ্বে ছুরি দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া, সিঙ্গা লাগাইয়া চুষিতে হয়। আবার বিষ দষ্টস্থান ছাড়াইয়া গেলেও, সুদক্ষ চিকিৎসক পরীক্ষা দ্বারা বিষের গতি বুঝিতে পারে, এবং তখন উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিয়া বিষ বাহির করিয়া ফেলে।

কিন্তু অজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য, দংশন করিবামাত্র দষ্টস্থানের মাংশপেশী দুইটী অঙ্গুলী দ্বারা টানিয়া ও তুলিয়া ধরিয়া, একটী অর্দ্ধ পয়সার আকারে ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলা। তাহার পর ঐ স্থান ভাল করিয়া পোড়ান।

কিন্তু এরূপ অবস্থায়, (অর্থাৎ যেখানে বন্ধন দ্বারা বিষ নিবারণের সম্ভব নাই এমন স্থানে দংশন করিলেও, অন্য কোনরূপ চিকিৎসার সুবিধা না হইলেও,) বিষের তীব্রতা হ্রাস করিবার উপায় উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। প্রথম দষ্টস্থানের চারিদিকে

ছুরি দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া লবণ দিয়া রগড়াইয়া দাও, তাহার পর থুবি প্রয়োগ কর, কিম্বা দষ্টস্থানে গরম জলের সেঁক দাও। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ বিষের তীব্রতা নষ্ট করিবে। এইরূপে বিষের তেজ কমাইতে পারিলে, ইহার গতিও সেই সঙ্গে কমিয়া আসিবে, এবং তখন রোগীকে চিকিৎসা করিবার অনেক সময় পাওয়া যাইবে। আবার বিষের তীব্রতা যদি হ্রাস করা যায়, তবে রোগীর শরীরে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ সকল প্রকাশ হইলেও, হয় ত রোগী অনেক সময় বাঁচিয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিকিৎসার দ্বারা মৃত্যুমুখ-পতিত অনেক রোগীকে আমরা আরাম হইতে দেখিয়াছি।

একটী কথা মনে রাখিতে হইবে। বিষ যতক্ষণ ভাণ্ডারে প্রবেশ না করিবে, ততক্ষণ উপরের লিখিত প্রণালী মত চিকিৎসা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিষ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলে দক্ষ চিকিৎসকও ঠিক করিয়া বলিতে পারে না যে, রোগীকে নিশ্চয় আরাম করিতে পারিবে কি না।

তাহারা বলে যে, বিষ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলে রোগীর শ্বাস-নালীতে এক প্রকার লালার সৃষ্টি হয়, এবং তখন তাহার মুখ দিয়া ফেণা উঠিতে থাকে। এই লালা দ্বারা রোগীর শ্বাসনালী বন্ধ হইয়া তাহার শ্বাস রোধ হইয়া আসে। তারপর, সে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারে না, এবং ইহাতেই তাহার মৃত্যু হয়।

এই লালা বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলেই রোগী জীবিত থাকিবে। সুতরাং, যাহাতে এই লালা দ্বারা শ্বাসরোধ হইয়া রোগী না মরে, তখন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ম/-বৈদ্যেরা বলে যে, এইরূপে লালা উঠাইয়া রোগীকে যদি ক্ষণ-

ক'ল জীবিত রাখিতে পারা যায়, তাহা হইতে রোগীর অবস্থা ক্রমে ভালর দিকে ফিরিবে, এবং এরূপ অবস্থায় কখন কখন বিনা চিকিৎসায়ও রোগী আরাম হইয়া উঠিয়াছে।

তাহারা রোগীর এই শ্বাসরোধ হওয়া নানা উপায়ে বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। কখন রোগীর মুখের মধ্যে একখানি নেকড়া কি হাত পুরিয়া দিয়া গলা হইতে লালা বাহির করিয়া দেয়, কখন রোগীকে অল্প অল্প করিয়া বারে বারে গরম জল খাওয়াইয়া দেয়। ইহাতে কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরে উত্তাপ লাগিয়া উহা পরিষ্কার হইয়া যায়। আবার কখন রোগীর গলায় গরম জলের সেঁক দেয়, কিম্বা উহাকে গরম জলের বাষ্প টানিতে দেয়।

যখন দেখিবে লালা দ্বারা রোগীর শ্বাসরোধ হইয়া আসিয়াছে, তখন যে গতিকে হউক তাহাকে চেতন রাখিতে হইবে। রোগী তখন তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িবে, এবং কখন তাড়াতাড়ি করিয়া জল খাইতে যাইয়া আপন জীবন নাশ করিবে। এরূপ তৃষ্ণার সময় তাহাকে অল্প অল্প করিয়া গরম জল খাইতে দিবে।

বিষ ভাণ্ডারে একবার প্রবেশ করিলে, সাতি থুবি প্রভৃতি চারি প্রকার চিকিৎসায় আর কোন ফল পাওয়া যাইবে না। তখন মালবৈদ্যেরা অন্যরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সর্পবিষের যে কোন ঔষধ আছে, কি মন্ত্রের দ্বারা দষ্টব্যক্তিকে আরাম করা যায়, তাহা মালবৈদ্যেরা বিশ্বাস করে না। তবে রোগীর অবস্থানুসারে তাহারা তেঁতুল, আমরুল, নেবু প্রভৃতি উদ্ভিদম্ল সেবন করিতে দেয়। তাহারা বলে, বিষে

মারাত্মক শক্তি নাশ করিবার যদি কোন ঔষধ থাকে, তবে সে উদ্ভিদন্ন। যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, কি শীঘ্রই করিবে, তখন তাহারা তেঁতুল ও তৈল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দেয়। আবার বন্ধন দ্বারা বিষের গতি রোধ হইলেও, অনেক সময় অনেক চিকিৎসক ভয়ক্রমে রোগীকে এই ঔষধ খাওয়াইয়া থাকে। কিন্তু পারদর্শী চিকিৎসক যদি নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, বন্ধন দ্বারা বিষের গতি নিশ্চয় রোধ হইয়াছে, তাহা হইলে সে রোগীকে কখন উহা সেবন করিতে দিবে না।

তেঁতুল পরিশুদ্ধ শরিষার তৈলে (অর্থাৎ তিসি ভাজ না থাকে) গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে। উহার এক কি অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে রোগীকে সেবন করাইয়া দিবে। বিষের উগ্রতা, পীড়ার বৃদ্ধি, এবং রোগীর অবস্থা ও অন্যান্য উপসর্গ অনুসারে মাত্রার বৃদ্ধি বা কম করা যাইতে পারে। যখন দেখিবে যে, বিষ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়াছে, তখন ঐ ঔষধের সহিত তুঁতে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হইবে। প্রত্যেক মাত্রায় ৫ গ্রেণ তুঁতে দিবে, এবং ৮।১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইবে। রোগীর অবস্থানুসারে ইহারও মাত্রা কম বেশী করিতে হইবে।

এই তেঁতুল তৈল ও তুঁতে মিশ্রিত ঔষধ ভিন্ন মালবৈদ্যেরা কখন কখন আঁইস জলও রোগীকে সেবন করাইয়া থাকে। যে সকল মাছের আঁষ্টে-গন্ধ বেশী, সেইরূপ কতকগুলি মাছ আনাইয়া ২॥০ সের জলে বেশ করিয়া রগড়াইতে হইবে। এইরূপ করিলে ঐ জলে খুব আঁষ্টে-গন্ধ হইবে। তখন ঐ জল নেকড়া করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। দেখ যেন ইহাতে আঁইস না থাকে।

এই আঁইস জল খানিকটা করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে।

উপরে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদম্লে সর্প বিষের মারাত্মক শক্তি কতক পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে। আবার তেঁতুলের দ্বারা বিষের উগ্রতা হ্রাস হয়। কিন্তু রোগীকে বমন করানই বোধহয় এই সকল ঔষধ সেবন করাইবার প্রধান উদ্দেশ্য। এই তেঁতুল তৈল কি আঁইস জল খাওয়াইয়া যদি বমন করান যায়, তবে রোগী তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া উঠিবে। প্রথমবার সেবনে বমি হইলেও, উহা আবার খাওয়াইবে। এইরূপে ২।৩ বার বমি করাইতে পারিলেই রোগী আরাম হইয়া যাইবে।

রোগীর মুমূর্ষাবস্থা হইলে, তখন যে গতিকে হউক তাহাকে বমন করান উচিত। কারণ কোন প্রকারে লালা বাহির করাই তখন রোগীকে আরাম করার একমাত্র উপায়। সুতরাং বমন করাইবার জন্য তাহার পেটে যতটা ধরে, অর্থাৎ গলায় গলায় হয়, এরূপ পরিমাণে তেঁতুল, তৈল ও তুঁতে মিশ্রিত করিয়া, কি আঁইস জল সেবন করান উচিত। এই রূপে বমন করাইতে পারিলে, ঐ বমনের সহিত তাহার পেটের মধ্যে যাহা থাকে তাহার সহিত লালা বাহির হইয়া পড়িবে। ইহাতেও যদি বমি না হয়, তবে গলার মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া বমি করাইবার চেষ্টা করিবে, এবং তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে, পাখীর পালক গলার মধ্যে দিয়া নাড়িবে।

ফলকথা, এরূপ অবস্থায় রোগীর উদরস্থিত দ্রব্য সকলের সহিত লালা তুলিয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যকীয়। যদি কোন প্রকারে বমন করান যায়, তবেই রোগীকে সহজে আরাম করিতে পারিবে।

কখন কখন রোগী তেঁতুল তৈল কি আঁইস জল আদপে গলাধ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সর্প চিকিৎসকেরা কলার মাইজ-পাতার নল গলার ভিতর পূরিয়া তাহার মধ্যে তেঁতুল ও তৈল কি আঁইস জল ঢালিয়া দিবে। কিন্তু ডাক্তারেরা উদর-পরিষ্কারক যন্ত্র (Stomach pump) কি অন্য কোন যন্ত্রের দ্বারা রোগীকে সহজেই উহা সেবন করাইতে পারিবেন। ডাক্তারদিগের বমনকারী ঔষধ ও প্রয়োগ করিয়া দেখা যাইতে পারে। তবে এরূপ মুমূর্ষাবস্থায় রোগীর মাংসপেশী ও স্নায়ু সকল অসাড় হইয়া যায়। সুতরাং তখন ডাক্তারি কোন ঔষধে বমি হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আসন্নকালে রোগী নাকী স্বরে কথা কহিবে, তাহার স্মরণশক্তি হ্রাস হইবে, জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে অসংলগ্ন কথা বলিতে থাকিবে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে চিৎ হইয়া শুইতে দিবে না, তাহাকে ঘুমাইতে কি কিছু আহার করিতে দিবে না, আর নানাবিধ কথাবার্ত্তায় তাহাকে জাগরিত করিয়া রাখিবে। যদি সে কথা কহিতে না পারে, তবে একজন কথা বলিবে, আর সে শুনিবে এবং ইশারায় উত্তর দিবে। রোগীকে খুব সাহস দিবে ও তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইবে এবং সে চক্ষে ঘোর দেখিবে। তখন তাহার চক্ষে আমরুলের রস দিলে চক্ষুর লাল্‌ কাটিয়া যাইবে।

দশম অধ্যায়।

অব্যর্থ বমনকারী ঔষধ ও জলসার।

পূর্ব্বে বলিয়াছি সর্পাঘাতের কোন ঔষধ নাই। তাহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছি। অর্থাৎ বিষের ক্রিয়া এত ত্বরিত যে, ঔষধ সেবন করিয়া শরীরে উহার কার্য্য হইবার পূর্ব্বেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ সব কথা এখনও বলিতেছি। তবে পূর্ব্বে ইহাও বলিয়াছি যে, যখন বিষ ভাণ্ডারে প্রবেশ করে, তখন রোগীর গলার ভিতর লালার সৃষ্টি হয়, আর ইহাতে তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসে। তখন কোন প্রকারে এই লালা তুলিয়া ফেলিয়া রোগীকে ক্ষণকাল জীবিত রাখিতে পারিলে, কখন কখন সে বিনা চিকিৎসায়ও ক্রমে আরাম হইতে পারে। এই লালা উঠাইয়া ফেলিবার জন্য মালবৈদ্যেরা, নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা গলায় আঙ্গুল কি নেকড়া দিয়া লালা উঠাইবার চেষ্টা করে। লালা উঠাইয়া রোগীকে কেবল ক্ষণকাল বাঁচান যায় বটে, কিন্তু একেবারে আরোগ্য করা প্রায়ই অসম্ভব। একেবারে আরোগ্য করার একমাত্র উপায় বমন করান। বমন করাইবার জন্য মালবৈদ্যেরা তেল, তেঁতুল ও তুঁতে মিশ্রিত করিয়া কি আঁইস জল খাওয়াইয়া দেয়। তাহাতে বমি না হইলেও গলায় আঙ্গুল কি পাখীর পালক দিয়াও বমন করাইবার চেষ্টা করে।

এই তেল, তেঁতুল কি আঁইস জলে অনেক সময়ই বমি হইয়া থাকে, কিন্তু কখন কখন তীব্র বিষের তেজে স্নায়ু ও মাংশপেশী সকল এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে, উহাতেও বমি হয় না। আর, এই কারণেই বমনকারক আর কোন ঔষধই এ সময় শরীরে কার্য্য করে না। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এমন একটী ঔষধের প্রয়োজন যাহা দ্বারা রোগীর একেবারে মুমূর্ষা অবস্থাতেও বমন করান যায়।

শ্রীভগবান করুণার সাগর। এই আসন্নকালে, যখন আর কোন ঔষধই বমন করাইতে না পারে, তখনও উপকার হয়, এমন ঔষধও তিনি আমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তবে রসিকশেখরের সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটু আমোদ আছে। এই যে অমূল্য ঔষধ জগতে রহিয়াছে, তাহা যাহাতে মনুষ্যের সহজসাধ্য না হয়, এই জন্য ইহাকে একটী মূলরূপে মাটির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। আবার মনুষ্য যাহাতে ইহা দেখিলেই সর্পের ঔষধ বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই জন্য ইহার অবয়ব ঠিক সর্পের ন্যায় করিয়াছেন। আমরা যখন প্রথমে এই ঔষধের কথা শুনিলাম, তখন ভাবিয়াছিলাম যে, আরও যেমন পাঁচ রকম ঔষধের কথা শুনা যাইয়া থাকে, ইহাও তাহার মধ্যে একটী হইবে। কিন্তু এই মূলের আকৃতি দেখিয়াই আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। হঠাৎ দেখিয়া আমাদের বোধ হইল যে, একটী গোক্ষুরা সর্প ফণা তুলিয়া রহিয়াছে।

এই গাছের নাম "নাগফণি"। ইহা নেপাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশে জন্মে এবং পশ্চিম প্রদেশীয় "ডুমডীওয়ালাদের

নিকট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। ইহার বমনকারী শক্তি এত অধিক যে, অতি সামান্য একটু খাই-সেই সারাদিন বমন করিতে হয়। আসন্নকালে, যখন স্নায়ু ও মাংশপেশী সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যখন অপর কোন ঔষধে বমন হয় না, তখনই সর্প ব্যবসায়ীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা সেবনের নিয়ম এই। এই মূল ২।৪ টী কুঁচ পরিমাণে নিমের পাতা ও কয়েকটী গোল মরিচের সহিত বাটিয়া খাইতে হয়। যখন রোগী মুখ দিয়া এই ঔষধ গলাধঃ করিতে না পারে, তখন অগ্রে নাকের মধ্যে একটী নল দ্বারা জোরে ফুৎকার দিয়া ইহা প্রবেশ করাইয়া দেও। দুই নাকের মধ্যে ঔষধ প্রবেশ করিলে, গলার লালা কমিয়া যাইবে, এবং তখন রোগী ঔষধ সেবন করিতে পারিবে। উদর-পরিষ্কায়ক যন্ত্র (Stomach pump) দ্বারাও ইহা সেবন করান যাইতে পারে একবার সেবনে বমি না হইলে পুনরায় খাওয়াইতে হইবে। ঔষধ সেবন করাইয়া অল্পকাল অপেক্ষা করিবে, যদি বমি না হয় তবে আবার খাওয়াইবে। তবে যখন রোগী ঔষধ সেবন করিতে পারে তখনও নাকের মধ্যে ঐরূপ ফুৎকার দ্বারা উহা প্রবেশ করান ভাল।

রোগীকে বার কয়েক বমন করাইতে পারিলেই তাহার শরীরের বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে। বিষ নষ্ট হইলে রোগী নিজেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে। তখন শরীর পাতলা বোধ হইবে, শরীরে সাড় হইবে, জ্বালা যন্ত্রণা কিছু থাকিবে না, অচৈতন্য ভাব যাইবে, আহ্লাদ বোধ স্বাভাবিক হইবে, এবং রোগী নূতন জীবনপ্রাপ্ত হইবে। তখন তাহার বোধ হইবে, সে এতক্ষণ ভয়ানক স্বপ্ন

দেখিতেছিল। শরীরে আরাম পাইয়া তাহার নিদ্রাকর্ষণ করিবে, ক্লান্তি ও ক্ষুধাবোধ হইবে। কিন্তু তাহাকে তখন কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত শয়ন করিতে, নিদ্রা যাইতে, কি কিছু আহার করিতে দিবে না। পা ছড়াইয়া হেলান দিয়া বসাইয়া রাখিবে। একটি কথা যেন মনে থাকে। সর্পদষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই প্রথম হইতে এইরূপে বসাইয়া রাখিতে হইবে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলেও মালবৈদ্যেরা রোগীর সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হয় না। তাহারা বলে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তির মহাপ্রাণী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেহত্যাগ করে না। বাহ্য পরীক্ষায় জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে না, শ্বাসক্রিয়া কি হৃদয়ের ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এরূপ রোগীকেও তাহারা আরাম করিয়াছে। এই জন্যই বোধহয় আমাদের দেশে সর্পাঘাতে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে না।

রোগীর এরূপ অবস্থা হইলে সর্পচিকিৎসকেরা তাহাকে "জলসার" করিয়া থাকে। "জলসার" দিবার নিয়ম এই। একেবারে ৪০।৫০ কলশী জল জ্বাল দিতে থাকিবে। জল অল্প গরম হইলে, রোগীকে বসাইয়া ৪।৫ হাত উচ্চ হইতে তাহার মাথায় জল ঢালিতে থাকিবে। এক কলশী ঢালা শেষ না হইতেই আর এক কলসী আনাইয়া যোগাইতে হইবে। এদিকে প্রথম কলশীতে জল পূরিয়া আবার জ্বাল দিতে থাকিবে॥ এইরূপ যখন যে কলশী খালি হইবে, তখনই তাহাতে আবার জল পূরিয়া গরম করিবে। ফল, যতক্ষণ জলের ধারাণী দিবে, ততক্ষণ যেন সমভাবেই দেওয়া হয়, আদপে বিরাম দিবে না। এইরূপ জল ঢালিতে ঢালিতে রোগী চক্ষু মেলিবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত

রোগীর কম্প না হয়, সে পর্য্যন্ত জল ঢালিতে থাকিবে। কম্প হইলে আর জলের ধারাণী করিবার প্রয়োজন করে না। এইরূপ কম্প হইলেই জানিবে যে রোগীর আর ভয় নাই, সে আরাম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জলসারে, যে সকল রোগীই আরাম হইবে তাহা নহে। কখন কখন এইরূপ জলসার দিয়াও রোগীর জীবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ হয় নাই। আবার এরূপও দেখা গিয়াছে যে, জলসার দিতে দিতে রোগী ক্রমে উঠিয়া বসিল, একটু পরেই সে ঢলিয়া পড়িল, এবং তাহা-তেই তাহার প্রাণত্যাগ হইল। বোধহয় এরূপ স্থলে রোগীর শরীর সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিষ না হইতেই জলসার বন্ধ করা হইয়া থাকিবে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে, এরূপ ব্যক্তির জলসারা দ্বারা আরাম হওয়া সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী ঘটনা জানি। তাহার মধ্যে একটী এখানে বলিতেছি। এ ঘটনাটী যদিও আমরা নিজে দেখি নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ লিখিতেছি।

"সে আজ ২০ বৎসরের কথা। একদিন আমরা কয়েক-জন খুল্না জেলার মধ্যে মহকুমা বাগেরহাটের নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছি। বেলা তখন ৯টা হইবে। দেখি, ঘাটের পার্শ্বে কতকগুলি লোক জমা হইয়াছে। কিছু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আমরা সেখানে গেলাম। যাইয়া দেখি, মাটিতে একটী মৃতদেহ পড়িয়া আছে, আর ৩।৪ জন লোক তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের নিকট মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "আমাদের বাড়ী এখান হইতে ৩ ক্রোশ দূরে।

কাল রাত্রে ইহাকে সাপে কাটিয়াছিল। কত রোজা দেখাইলাম, কত চিকিৎসা করিলাম, কিছুতেই আরাম হইল না, শেষরাত্রে মরিয়াছে। গ্রামের চৌকিদার বলিল, কোম্পানির হুকুম আছে, সাপে কাটিলে সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা না করিলে, লাশ জ্বালান যায় না। তাই ডাক্তারকে দেখাইতে এখানে আনিয়াছি।'

"আমাদের সঙ্গে মুন্সেফি আদালতের একটা আমলা ছিলেন। তিনি ঐ কথা শুনিয়া মৃতদেহের নিকট যাইয়া বসিলেন ও তাহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিয়া উঠিলেন 'আমি ইহাকে বাঁচাইব।' আমরা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 'আমোদ নহে. আমি উহাকে নিশ্চয় আরাম করিব।' ইহা'ই বলিয়া তিনি কয়েকটী কলশী ও কলার একটী মোচা আনিতে বলিলেন। তখনই তাহার ফরমাইস মত জিনিষ আনা হইল। তিনি মোচার উপরি ভাগ গোল করিয়া কাটিয়া লইলেন। তখন মৃতদেহকে এক জন ধরিয়া বসিল, আর তিনি তাহার মাথার তালুতে ঐ মোচার অগ্রভাগ ঘসিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘঁসিয়া, তাহার মাথায় ৪।৫ হাত উপর হইতে সমান ভাবে জলের ধারানী দিতে বলিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইরূপ জল ঢালিবার পরও রোগীর দেহে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তখন তিনি একখানি কাপড় বেশ করিয়া পাকাইয়া লইয়া, ঐ কাপড় মৃত্যু ব্যক্তির পৃষ্ঠে জোরে মারিতে লাগিলেন; এদিকে জলও সমভাবে তাহার মাথায় ঢালা হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলের ধারানী দিতে

দিতে রোগীর চক্ষুর পাতা অল্প অল্প কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে গাত্রের লোম সকল খাড়া হইয়া উঠিল। তাহার পর সেই মৃত-দেহ সত্য সত্যই চক্ষু মেলিল! আমরা দেখিয়া অবাক হইলাম। দেখিতে দেখিতে তাহার সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কম্পন আরম্ভ হইল। জ্বর আসিবার সময় যেরূপ কম্পন হয়, অর্থাৎ ২।৩টা লেপ গায়ে দিয়া ঠাসিয়া ধরিলেও কম্পন থামে না, এ সেইরূপ কম্পন। তখন জলের ধারানী বন্ধ করা হইল। ক্রমে রোগীর চেতন হইল। গাঢ় নিদ্রার পর হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ ভাব হয়, রোগী তখন সেই ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহার পর অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি এখানে কেন?" তাহার সেই কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গীগণ কান্দিয়া উঠিল। যাহা হউক রোগী ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল।

"বেলা তখন প্রায় ২টা বাজিয়াছে। আমরা স্নানাহার ভুলিয়া নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। সত্য কি স্বপ্ন দেখিতেছি সে বোধ নাই। ক্রমে রোগী উঠিয়া দাঁড়াইল, আস্তে আস্তে হাটিয়া নৌকায় উঠিল, এবং নৌকায় বসিয়া পা ঝুলাইয়া পা ধুইতে লাগিল। তাহার পর তাহারা সকলে ত্বরিত বেগে নৌকা বাহিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল।"

এই যে "জলসার" করা হইল, ইহা গরম জল দ্বারা নহে। তবে মাথায় উত্তাপ সঞ্চার করিবার জন্যই বোধহয় মোচার অগ্রভাগ দ্বারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ঘসিয়া লওয়া হইয়াছিল? আর, রোগীর অসাড় দেহে সাড় করিবার জন্য বোধহয় কাপড় পাকাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহার পৃষ্ঠে মারা হইতেছিল।

একাদশ অধ্যায়।

কানড় সর্প-দংশনের চিকিৎসা।

ফণাধারী সকল সর্পের দংশনেই ঠিক এক রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ফণাহীন ভিন্ন ভিন্ন সর্পের দংশনে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়। বাঙ্গালা দেশে এক প্রকার সর্প প্রায় চক্ষে পড়ে, ইহারা দংশন করিলে রোগীর দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়িতে থাকে। আবার বোড়া সাপে কাটিলে দষ্টস্থান পচিয়া যায়, আর সেই জন্যেই ইহাদিগকে সাধারণতঃ পচাবোড়া বলে। বোড়ার বিষদাঁত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লম্বা, সুতরাং তাহারা দংশন করিলে বন্ধন খুব দৃঢ় করিয়া দিতে হয়, এবং সেই জন্যই বোধহয় দষ্টস্থান পচিয়া উঠে।

ফণাধারী সাপের বিষের ন্যায় কানড়ের বিষ তত উগ্র না হইলেও, ইহারা দংশন করিলেই যদি বিষ সাহার্য্য না করা হয়, তবে রোগী প্রায় মারা পড়ে। নানা করণে ইহা-দিগকে করিয়া বেশী ভয়। প্রথমতঃ ইহারা মনুষ্য আবাসেই থাকে, দ্বিতীয়তঃ ইহাদের দংশন কম যন্ত্রণাদায়ক, এবং তৃতীয়তঃ ইহারা মনুষ্যের পৃষ্ঠদেশে দংশন করিতে পারে। তুমি নিদ্রা যাইতেছ, কি অর্দ্ধ নিদ্রাবস্থায় আছ, কানড় সর্প তোমাকে দংশন করিল। দংশন মাত্রেই অল্প অল্প চিন্ চিন্ করিয়া উঠিল, তুমি উহা গ্রাহ্য করিলে না। তাহার পরে

তুমি এই দংশনের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলে। ক্রমে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, আর উঠিলে না। সর্পে দংশন করিবার পর নিদ্রা গেলে, সে রোগীর বাঁচিবার আশা কম। এইরূপে প্রতি বৎসর অনেক শিশু সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কানড়ে দংশন করিলে প্রথমে পূর্ব্ব লিখিত প্রণালী অনুসারে (অর্থাৎ স্যাতি, থুবি, পিং, বেড়ি) চিকিৎসা করিতে হইবে। কিন্তু বিষ ভাণ্ডারে প্রবেশ করিলে, শরীর ফুলিতে থাকিবে। এই-রূপ ফুলিতে আরম্ভ করিলে বুঝা যাইবে যে, কানড় সর্পে দংশন করিয়াছে। কখন কোন বিশেষ অঙ্গ, আবার কখন সমস্ত শরীর ফুলিয়া পড়িবে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে অগ্নির উত্তাপ কি গরম জলের ভাবরা দিতে হইবে। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়াই অধিক ফলদায়ক।

অগ্নির উত্তাপ দিবার নিয়ম এই। প্রথম রোগীর পার্শ্বে মাটিতে একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে ঘুঁটে দিয়া পরিপূর্ণ করিবে। তাহার পর ইহাতে আগুণ দিয়া বাতাস দিবে। যখন অধিক পরিমাণে ধূমা নির্গত হইতে থাকিবে, তখন এই গর্ত্ত ও রোগীকে একখানি কম্বল কি অন্য কোন মোটা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিবে। নিশ্বাস ফেলিবার জন্য কেবলমাত্র রোগীর নাসিকা বাহির রাখিতে হইবে। রোগী হয়, দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিবে, কি অধিক দুর্ব্বল বোধ হইলে, চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিতেও পারে।

আর গরম জলের ভাবরা এইরূপে দিতে হয়। প্রথম একটী পাত্রে জল জ্বালাইবে। এই জল খুব গরম হইলে রোগীর নাক বাদে সমস্ত শরীর একখানি মোটা কাপড়

কি কম্বল দ্বারা ঢাকিয়া দিবে। তাহার পর একটী নলদ্বারা ঐ গরম জলের বাষ্প রোগীর গাত্রাচ্ছাদিত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। কেহ কেহ এই জলে চৈয়ের পাতা দিয়া থাকে। এই পাতার আর কোন গুণ আছে কি না জানি না, তবে উহাতে বাষ্প যে অধিক ফলদায়ক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। *কিন্তু এই পাতা না দিলেও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না।*

কথনবা রোগীকে খাটিয়ায় শোয়াইয়া ভাবরা কি অগ্নির উত্তাপ দেওয়া হয়। রোগীর শরীর হইতে ঘর্ম্ম নির্গত করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ক্ষণকাল এইরূপ উত্তাপ কি ভাবরা দিবার পর, রোগী আর এ ভাবে থাকিতে চাহিবে না। কিন্তু তথন রোগীর কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে। তবে যথন দেখিবে যে রোগীর উহা অসহ্য হইতেছে, তথন অবশ্য তাহাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিবে। কিন্তু তাই বলিয়া রোগীর গাত্র হইতে কাপড় তুলিয়া ফেলিও না, কেবল অগ্নি কি বাষ্পের নল ঐ গাত্রাচ্ছাদিত বস্ত্র হইতে বাহির করিয়া লইবে।

প্রথমবার এইরূপ উত্তাপ কি ভাবরা দিবার পর দেখিবে যে রোগীর অতিশয় ঘর্ম্ম হইতেছে, এবং তাহার ফুলাও কিছু কমিয়াছে। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার ঐরূপে উত্তাপ কি ভাবরা দিতে থাকিবে। ইহাতে রোগী খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, কিন্তু এইরূপে ২।৩ বার দিবার পর রোগী অনেকটা আরাম বোধ করিবে। কখন কখন গাত্রের বসন ঘর্ম্মে খুব ভিজিয়া যাইবে। তথন বদলাইয়া তাহাকে একখানি শুষ্ক বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া দিবে। এরূপ স্থলে শুদ্ধ অগ্নির উত্তাপে অপেক্ষা ধুমা সহ অগ্নির উত্তাপ প্রয়োগে অধিক ফল পাইবে।

যখন দেখিবে যে, রোগী সতেজ হইতেছে এবং ফুলাও ক্রমে কমিতেছে, তখনই এই উত্তাপ কি ভাবরা বন্ধ করিয়া দিবে। কিন্তু ফুলা আবার বৃদ্ধি হইতেছে দেখিলেই, আবার ঐরূপ দিবে।

মালবৈদ্যেরা বলে যে, কানড় সর্পে দংশন করিবার পর বাহ্যদৃষ্টিতে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে বোধ হইলেও, হতাশ হওয়া উচিত নহে। তাহার পরেও কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহাকে চিকিৎসা করিবে। তাহারা বলে যে, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে এরূপ বোধ হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা কাটিয়া গেলেও তাহারা রোগীকে কখন কখন বাঁচাইয়াছে।

কানড়ের দংশনে এইরূপ মৃত্যুপ্রায় হইলে মালবৈদ্যরা এইরূপে রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকে। প্রথম রোগীকে খাটিয়ার উপর শয়ন করাইয়া সমস্ত শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া অগ্নির উত্তাপ কি ভাবরা দিবে। রোগীর নাক অবশ্য খুলিয়া রাখিতে হইবে। খানিক পরে দেখিবে, যে রোগী একটু পূর্ব্বে মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তাহার ঘর্ম্ম হইতেছে। কখন কখন জীবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হইলেও ঘর্ম্ম হইতে থাকিবে। কিন্তু অনেক সময় বেশ বুঝা যাইবে যে, প্রকৃত রোগীর মৃত্যু হয় নাই। এরূপ দেখিলেই চিকিৎসা করিতে থাকিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

মোটামুটি চিকিৎসা।

পূর্ব্ব কয়েক অধ্যায়ে আমরা সর্প চিকিৎসা প্রণালী বিস্তৃত করিয়া বলিলাম। অনেকে হয় ত উহা পাঠ করিয়া, সর্প-দংশন করিলে পর পর কি প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইলে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। সেইজন্য আমরা নিম্নে সর্পদংশনের চিকিৎসা পর পর কি প্রণালীতে করা উচিত তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিতেছি।

১। সর্পে দংশন করিবামাত্র দষ্ট অঙ্গ ঝাড়া দিয়া সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিবে।

২। দংশন মাত্রই দষ্ট-স্থানের উপর অন্ততঃ একটী বন্ধন দিবে। যদি তখনই বন্ধন করা সুবিধা না হয়, তবে যত শীঘ্র পার বান্ধিবে। কিন্তু বন্ধন করিতে যত বিলম্ব হইবে, তাহাই বুঝিয়া দষ্ট-স্থানের তত উপরে বান্ধিতে হইবে। তাহার পর ২।৩ ইঞ্চি অন্তর প্রথম বন্ধনের উপর আরও দুইটি বন্ধন দিবে।

৩। বন্ধন করিয়াই দষ্টস্থান চুষিয়া বিষ তুলিয়া ফেলিবে। যখন দেখিবে বন্ধন করিতে দেরী হইবার সম্ভব, তখন দংশন মাত্রেই, যদি সুবিধা হয়, তবে নিজে চুষিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে। তবে পানসা দাঁত কি মুখে ঘা থাকিলে

কথনই চুষিও না। যতক্ষণ তিক্ত আস্বাদ পাইবে ততক্ষণ চুষিতে হইবে। যদি ছিদ্রের মুখ ছোট হয়, তবে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা চিরিয়া ছিদ্র বড় করিয়া লইবে। যে স্থানে বন্ধনের সুবিধা না হয়, সেখানে চুষিয়া বিষ উঠান খুব আবশ্যক।

৪। এরূপ স্থানে যদি দংশন করে, যেখানে বন্ধন করা কি চুষিয়া রক্ত উঠান সুবিধা না হয়, তবে দষ্টস্থান তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটী অর্দ্ধ পয়সার আকারে কাটিয়া ফেলিবে।

৫। এইরূপ কাটিয়া ফেলিয়া ঐ স্থান জ্বলন্ত অঙ্গার কি উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ঐ স্থান পোড়াইয়া দিবে। ঐরূপে কাটিয়া ফেলা যদি সুবিধা না হয়, তাহা হইলেও দষ্টস্থান পোড়াইয়া দিবে।

৬। বন্ধন করিবার পর, (চুষিয়া বিষ উঠান, ছুরিকা দ্বারা অর্দ্ধ পয়সার আকারে কাটিয়া ফেলা, ও অগ্নি দ্বারা দষ্টস্থান দগ্ধ করা (সুবিধা হউক বা নাই হউক,) তীক্ষ্ণ ছুরিকার অগ্রভাগ দিয়া প্রথম বন্ধনের নিম্নে ঘন ঘন ও অল্প অল্প করিয়া চিরিয়া দিবে। এই স্থানে বিষ থাকিলে কাল রক্ত বাহির হইবে। প্রথম বন্ধনের নিম্নে যদি কাল রক্ত পড়ে, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধনের মধ্যস্থান ঐ ভাবে পরীক্ষা করিবে। সেখানে যদি ঐরূপ কাল রক্ত পাওয়া যায়, তবে তৃতীয় বন্ধনের উপর আর একটী বন্ধন দিবে।

৭। ছুরী দ্বারা চিরিয়া যেখানে কাল রক্ত পাইবে, সেখানে লবণ বেশ করিয়া রগড়াইয়া গরম জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিবে। এইরূপ লবণ মাখানকেই "পিং" বলে। এইরূপে একবার ধুইয়া স্থানিক বিরাম দিবে। আবার ছুরী দ্বারা চিরিয়া রক্ত পরীক্ষা করিবে, এবং রক্ত বিবর্ণ দেখিলেই আবার সেই...

ছুরীর অগ্রভাগ দ্বারা ঘন ঘন চিরিয়া আবার ঐরূপ লবণ দিয়া রগড়াইয়া গরম জলে ধুইবে। এইরূপে যতক্ষণ রক্ত বিবর্ণ দেখিবে, ততক্ষণ "সাত্তি" ও "পিং" চিকিৎসা করিবে। যখন রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ দেখিবে, তখন বেশীক্ষণ বিরাম দিয়া, তাহার পর আবার ঐরূপ পরীক্ষা করিবে। অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত যদি রক্ত বেশ স্বাভাবিক বর্ণ থাকে, তবে, জানিবে যে শরীরে আর বিষ নাই।

৮। যতক্ষণ শরীর সম্পূর্ণ নির্ব্বিষ না হইবে, ততক্ষণ রোগীকে পা ছড়াইয়া বসাইয়া রাখিবে, ঘুমাইতে দিবে না, কিছু খাইতে দিবে না, নানাবিধ কথাবার্ত্তা বলিয়া অন্য মনস্ক রাখিবে, আর অনবরত সাহস দিবে।

৯। যখন দেখিবে যে বন্ধন দ্বারা বিষের গতি রোধ হইতেছে না, তখন যে বন্ধনের নিচে পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে, সেই বন্ধনের উপরে "বেড়ি" দিবে।

১০। যখন বিষ বন্ধন স্থান ছাড়াইয়া উঠিবে, তখন এই সকল চিকিৎসায় কোন ফল হইবে না, এবং তখন অগ্নির উত্তাপ কি ভাবরা দিতে হইবে, কি বমট সেবন করিতে দিবে।

১১। তেল তেঁতুল ও তুঁতে কি আঁইস জল খাওয়াইয়া বমন করাইবে। ইহাতে বমি না হইলে গলায় অঙ্গুলি কি পাখীর পালক দিয়া বমি করাইবার চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতেও বমি না হয়, আর যদি নাগফণি কাছে থাকে, তবে তাহাই খাওয়াইবে।

১২। শেষ চিকিৎসা "জলসার"। অর্থাৎ যখন দেখিবে যে রোগীর জীবনের আর কোন আশা নাই, এমন কি,

রোগী মরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, তখন এই জল-সার" দ্বারা উপকার হইবার সম্ভবনা।

১৩। কানড় সর্প দংশন করিলেও প্রথম উপরি উক্ত প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে। কিন্তু উহার বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে শরীর ফুলিতে থাকিবে। তখন বাষ্প, ভাবরা ও বমট প্রয়োগে রোগীর চিকিৎসা করিবে

সম্পূর্ণ।